প্রথম প্রকাশ . ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

প্রকাশিকা . সুমতি রায়

মাঝি প্রকাশনী . ৭ সুকিয়া রো কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক . মাঝি পত্রিকা-প্রেস

৭ সুকিয়া রো কলকাতা ৭০০ ০০৬

দেবকুমার ভট্টাচার্য

নৃপেন্দ্র সাহা

জগন্নাথ হালদার

গন্ধর্ব-র দিনগুলিকে



সূ চি প ত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা: শব্দহীন শোভাযাত্রা, যে যেখানে আছো,
কালের নিসর্গ দৃশ্য, কালের রাখাল তুমি ভিয়েতনাম,
যখন প্রথম ধরেছে কলি, এ জন্মের নায়ক

কাব্য নাটক: এক রাত্রির জন্য, পদধ্বনি পলাতক

ভ্রমণ: মস্কো থেকে দেখা, অন্য দেশ অন্য নগর

প্রবন্ধ: আধুনিক কবিতার উৎস, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ

কয়েকটি কথা

কাব্যনাটক বাংলা সাহিত্যের নতুন পরীক্ষা। বাংলা কবিতায় এর সার্থকতা কতটুকু, এ নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমাদের মনেও এই জিজ্ঞাসা যে উঁকি দেয়নি তা নয়। কবিতার একটা নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, নাটকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। গদ্যনাটকে দর্শকরা বা পাঠকরা যা আশা করেন, কাব্যনাটকে তার ব্যতিক্রম ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু নাট্যরস দুইয়েরই লক্ষ্য। এই রস সঞ্চার করতে না পারলে গদ্যনাটক যেমন বিড়ম্বিত হয়; কাব্যনাটকেরও সেই দশাই ঘটে। নাটক তা গদ্যেই লেখা হোক কিংবা কবিতার বাহনেই পরিবেশিত হোক তার সার্থকতা বিচার হবে নাটকীয়তা দিয়েই। কবিতাকে গীতিময়তা বা উপাখ্যানের কথা হিসেবে বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলা কবিতা ছিল অতিরিক্ত গীতিপ্রবণ, তার মধ্যে ঋজুতা এবং বাস্তব জীবনের সংযত আবেগ আধুনিক মননের সৃষ্টি। কবিতাকে জীবনের উপরিতলের প্রতিবেদন হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে এতকাল। উপাখ্যানমূলক কাব্যেও সাধারণ বাস্তব জীবনের অনুভবকে বিবৃত করার কতটুকু চেষ্টা হ'য়েছে। এর একটি কারণ সম্ভবত এই যে আমাদের কবিতার ভাষা এবং ছন্দ সাধারণ জীবনের ভাষা ও অনুভূতির পক্ষে সহজবোধ্য ছিল না। বরং জীবনের রুক্ষতা, অসার্থকতা এবং উত্তপ্ত কর্ম কটাহ থেকে মুক্তি পাবার জন্য কবিতাকে গ্রহণ করা হয় সান্ত্বনার প্রশান্ত কেন্দ্র হিসেবে। সব দেশের মানুষই তা চায়। কবিতা জীবনের মধ্যে থেকেও তার অতিরিক্ত কিছু। সে জন্যেই গল্প বা উপন্যাসের বিরাট ব্যাপ্তির পরও পাঠক কবিতায় ডুব দেয় গভীরতার আস্বাদন আশায়। এই গভীরতাই কবিতার স্বাতন্ত্র্য। তার সংযম, তার সংহত কেন্দ্রবিন্দু জীবনের নির্যাস, তার প্রতিবিম্বন। পদ্মের পাতায় শিশির বিন্দুতে যেমন আকাশের ছায়া পড়ে, কাব্যের স্বল্পপরিসরে, তার সংযত প্রকাশেও তেমনি প্রবহমান জীবনের প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু সময় যতই এগোচ্ছে কবিতার পরিধিও তত বাড়ছে। নাটকে কবিতার ব্যবহারও তার অভিজ্ঞতার নতুন পরীক্ষা। জীবনের কাছে কবিতার যে ঋণ, নাট্য আঙ্গিকে সেই ঋণ শোধেরই বিনীত প্রয়াস। গদ্যনাটককে চ্যালেঞ্জ করা এর উদ্দেশ্য নয়, তার নিজস্ব গণ্ডীতেও অবৈধ অনুপ্রবেশ করা হয়নি এ প্রচেষ্টায়। কাব্যনাটক কবিতা ও নাটকের

স্বপ্ন দাবী মেটাতেই এগিয়ে এসেছে। জীবনের সমতলের অন্তরালে তরঙ্গায়িত সংক্ষোভকে কাব্যনাটক যদি সার্থক ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারে তাহলেই মনে করবো এই আঙ্গিকের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে।

কবিতায় জীবনের স্বপ্ন ও প্রতীকের আবরণ রয়েছে। নাটকে রয়েছে জীবনের সংঘাত। স্বপ্ন ও সংঘাতের পরস্পর সামঞ্জস্য ও সম্মিলন না হলে কাব্য কখনো নাটক হতে পারে না এবং তদর্থে নাটকও কাব্যের স্বপ্নপুরীতে ধূলো পায়ে গিয়ে উপস্থিত হতে পারে না। শুধু মাত্র ভাল কবিতা শোনার জন্য দর্শকরা নিশ্চয়ই প্রেক্ষাগৃহে দু'ঘণ্টা বসে থাকবেন না। এটা হবে তাঁদের বাস্তব সত্তার প্রতি উৎপীড়ন। কবিতা তখনই দর্শকদের কাছে আস্বাদ্য হবে যখন তা নাটকীয় গুণে হবে সমৃদ্ধ। কাব্যনাটক নিয়ে ইয়োরোপে গভীর পরীক্ষা হয়েছে এবং আধুনিকতম কালে এসেও এই পরীক্ষা থামেনি, যদিচ পাশ্চাত্য দেশে গদ্যনাটকের শক্তি ও প্রভাব আমাদের সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ় ও স্থায়ী। বাংলা সাহিত্যে নাটকে পদ্যের ব্যবহার সার্থকভাবে করেছেন গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা এবং মেঘনাদবধ নাটকীয় সম্ভাবনায় পূর্ণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে কবিতার ভাষা ব্যবহৃত হলেও কবিতা সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে নাট্যরীতি হিসেবে। কাব্য প্রকরণের মূল্য সেখানে ছিল নাট্যরীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

কবিতাও নাটকের সার্থক প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথে প্রথম। তাঁর অনেক প্রতীকী গদ্যনাটকও কাব্যের সমগোত্রীয় (রাজা, রক্তকরবী, মুক্তধারা)। কাব্য-নাট্যের সার্থকতা আরও স্পষ্ট এবং অবিসম্বাদী হয়েছে, 'চিত্রাঙ্গদা' 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ও 'মালিনী'তে। এদের মধ্যেই কাব্য ও নাটকের দেনা পাওনা সুষ্ঠু-ভাবে ধরা পড়েছে। স্বপ্ন ও সংঘাতের আশ্চর্য সামঞ্জস্য পাওয়া যায় চিত্রাঙ্গদার জিজ্ঞাসায়, মালিনীর অন্তর্দ্বন্দ্বে, সুপ্রিয়র দ্বিধাগ্রস্ততায়, কুন্তীর আকুলতায় ও কর্ণের চেতনার জাগরণে।

আধুনিক বাংলা কাব্যনাটকের পূর্বসূরী হিসেবে তাই রবীন্দ্রনাথকেই গণ্য করা যেতে পারে। যদিও তত্ত্বের দিক থেকে আধুনিক কাব্যনাটক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সম্ভবত পশ্চিমীদের কাছে ঋণ বেশি। রবীন্দ্রনাথ এর নাম দিয়েছিলেন নাট্যকাব্য আমরা বলি কাব্যনাটক।

কাব্যনাটক অথবা নাট্যকাব্য রচনায় কবিতার জন্য নাটককে থামিয়ে রাখা হয়নি। অন্তত রবীন্দ্রনাথের নাটকে তো নয়ই। আধুনিক কাব্যনাট্য

রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এ শিক্ষা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হয়। কাব্যনাটক চাইছে সমসাময়িক জীবনের প্রশ্নকে ধরতে। রবীন্দ্রনাথ কাহিনী চয়ন করেছেন মহাকাব্য থেকে। লোক প্রচলিত উপাখ্যানের অংশবিশেষ তাঁর নাট্যকাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে; লৌকিক মিথ্‌ নিয়ে কাব্যনাটক রচনার প্রয়াসও চোখে পড়ে। কবিতা যে অর্থে মিথ্‌ সৃষ্টি করে, কাব্যনাটকে সে অর্থেই মিথ্‌ প্রবেশ করবে। পূর্বে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারই পুনরুক্তি করে বলা যায় যে কাব্যনাট্যের নাটকীয় সংগতিই সবচেয়ে আগে বিচার্য এবং তার সঙ্গে থাকবে কাব্যের তন্ময়তা। নতুবা গদ্যনাটক থেকে কাব্যনাটকের স্বাতন্ত্র্যের দাবি কোথায় তা স্পষ্ট বোঝা যাবে না। কবিতার আঙ্গিক তার ছন্দ ও ভাষাও নাটকের উপযোগী হয়ে ওঠে। নইলে নাটকীয় ঘটনা বা চরিত্রের সংলাপের উপযোগী হতে পারে না কাব্য-নাটক।

এইটেই আমার মতে আধুনিক কবিদের, যাঁরা নাটক লিখতে প্রয়াসী, সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বিষয়। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে কবিতা ও গদ্যের কৃত্রিম বেড়াটুকু ভেঙ্গে দেবার। দর্শকের সামনে কবিতাই পরিবেশন করা হবে কিন্তু তাদের সচেতন না করে। তারা নাটকীয় আবেগ, তার সংঘাতে ও গতিতে ভেসে চলে যাবে, কখন তাঁদের কবিতা শোনানো হলো তা যেন তারা বুঝতে না পারে। মলিয়েরের সেই নাটকের চরিত্রের মতো, যে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিল যে প্রতিদিন সে যা ভাষা ব্যবহার করছে তারই নাম গদ্য। কাব্য নাটকেও প্রতিদিনের আবেগের সঙ্গেই কবিতাকে মিশিয়ে দেওয়া যাতে নাটকের চরিত্র বুঝতে না পারে যে কবিতা বলা হচ্ছে, দর্শকরাও যেন কবিতার জন্য আলাদাভাবে কোনো একটা বিশেষ মুহূর্তে কিংবা বিশেষ কোনো চরিত্রের বেলায় উৎকর্ণ হয়ে না ওঠে কবিতার প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি পঙক্তির রসাস্বাদনে। গদ্য নাটকেও তো অতি আশ্চর্য গদ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের গদ্য কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের গদ্য থেকে নিশ্চয়ই উন্নত স্তরের। পাঠকরা কিংবা দর্শকরা তা শুনে চমকিত হন, আনন্দিত হন কিন্তু তাকে কৃত্রিম বলে মনে করেন না। যদি কৃত্রিম মনে করতেন তা হলে নাটকীয় চরিত্র ও দর্শকের মধ্যে দূরত্বের প্রাচীর মাথা চাড়া দিত নিঃশব্দে। নাটক জমত না।

সচেতন কাব্য সৃষ্টি যতটা কম উপস্থিত হয় কাব্য নাটকে, নাটকীয়

সার্থকতার সম্ভাবনা ততই বেশী করে তাতে পাওয়া যাবে। শিল্পকে তাতে সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু শিল্পের সচেতনতার চিহ্ন যেন তাতে না থাকে। কাব্যনাটকের যা উপজীব্য তা একান্তভাবেই কবিতার ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই ধর্ম কি তা জানা থাকলে এ নিয়ে বিরোধের কোনো অবকাশ থাকে না। কবিতাকে অন্তঃচারী দ্বন্দ্বের বাহন হিসেবে রূপায়ণেই কাব্যনাটকের বৈশিষ্ট্য। এবং সে হেতুই কাব্যনাটককে বলা যায় অন্তর্নাটক। তবে কাব্যনাটক মাত্রেই সিম্বলিক ড্রামা নয়। সিম্বলের প্রয়োজনও নেই এখানে। কারণ গোটা নাটকটাই ভিতরকার সমস্যা থেকে উদ্ভূত। লোরকার নাটকে স্প্যানিস লোককাহিনী, মিথ্ এবং জাদুমন্ত্রের পরিমণ্ডলের সুষ্ঠু প্রয়োগ আছে। হিস্পানি ট্র্যাডিশানও ভাবনার সঙ্গে তা বেশ মানিয়ে যায়। অনেকে মিথ্‌কে কাব্যনাট্যের অবলম্বন রূপেও সার্থক ভাবে ব্যবহার করেন। সেক্সপীয়রের নাটকে তিন ডাইনী-র অবিশ্বাস্য সংলাপকেও বিশ্বাসযোগ্য রূপে প্রতিভাত করা হয়েছে। হ্যামলেটের পিতার অলৌকিক কণ্ঠস্বরও অনায়াসেই শোনা গেল। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের অালৌকিকত্ব যাত্রার পালায় হামেশা দেখা গেছে। তবে আধুনিক কাব্যনাটকে এর সার্থকতা খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। দাদাঠাকুর, বাউল কিংবা বিবেক জাতীয় পদার্থের আমদানিও কাব্যনাটকের দুর্বলতা। আধুনিক কাব্যনাটক স্পষ্ট ভাবে ও প্রত্যক্ষভাবে যুগের মানসিকতাকে গভীর সংকেতে প্রকাশ করলে তা সার্থকতা পায়। তার ঘটনা চরিত্র এবং সংলাপ কবিতা ও নাটকের যুগল দাবি পূর্ণ করে নিজস্বতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বাংলা সাহিত্যে এই নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অনেক কবি কাব্যনাটক রচনায় এগিয়ে এসেছেন। যদিও পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক রচনায় সিদ্ধি এখনও করতলগত হয়নি, একাঙ্ক কাব্যনাটক রচনায় কারো কারো সাফল্য স্বীকৃত।

এই সংকলনে কয়েকটি কাব্যনাটকই মাত্র নির্বাচন করা গেল। তার মধ্যে আমার পূর্বতন কাব্যনাটক 'এক রাত্রির জন্য' এবং 'পদধ্বনি পলাতক' গ্রন্থে প্রকাশিত নাটকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবকটি নাটকই বিভিন্ন সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত। একটি কি দুটি অভিনীত হয়েছে মঞ্চে, বেতারেও অভিনীত হয়েছে শ্রুতি নাটক হিসেবে। এই নাটকগুলোর রচনাকাল ১৯৬০-৮০ এই কুড়ি বছর। এই দুই দশকে নাটকের ভাবনাচিন্তারও বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। পাঠকরা যদি এগুলো পড়েন এবং কখনও অভিনয় করেন বা

দেখেন তাহলে বোঝা যাবে নাটক হিসেবে এর আলাদা কোনো মাত্রা উপার্জিত হয়েছে কিনা।

কাব্যনাটকে আমি নানারকম বিষয় ব্যবহার করেছি। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ঘটনা থেকে যেমন কবিতার জন্ম হয় তেমনি মানুষের পরিচিত জীবনকেই কাব্যনাটকে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা হয়েছে। আমার সমসাময়িক পূর্বসূরী এবং অনুজ কবিদের রচনায় সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই এগুলো বিচার্য। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে যে কাব্যনাটকের সঙ্গে মঞ্চের যোগ থাকা আবশ্যিক। কলকাতায় বিভিন্ন সময়ে কাব্যপ্রেমিক ও নাট্যোৎসাহীরা কখনো-কখনো দু একটা কাব্যনাটক মঞ্চস্থ করেছেন। দিলীপ রায়ের 'সার্কাস' এবং রাম বসুর 'নলিকণ্ঠ' পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রমেলায় অভিনীত হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে কাব্যনাটকের মঞ্চাভিনয় এই প্রথম।

গন্ধর্বনাট্যগোষ্ঠী ১৯৬০ সালে ছ মাসব্যাপী নাট্যোৎসবে এই লেখকের 'এক রাত্রির জন্য' অভিনয় করেন। এরপর বেতারে শ্রুতিনাটক হিসাবে অনেক বিশিষ্ট আধুনিক কবির কাব্যনাটক পরিবেশিত হয়। প্রয়াত কেয়া চক্রবর্তীর একক কণ্ঠে এই লেখকের 'বনজ্যোৎস্না' তার অন্যতম। 'এক রাত্রির জন্য' বেতারেও পরিবেশিত হয়। অভিনয় হলে বোঝা যায় তার কোথায় গুণ, কোথায় দুর্বলতা। অভিনয় হবে ভেবেই এগুলো লেখা। শুধু পাঠ্যনাটক হিসেবে যদি কেউ এগুলো পড়ে তেমন মজা না পান তাহলে অবশ্য দোষ লেখকের। কেননা অভিনেতার উচ্চারণে এর অনেক ত্রুটি হয়তো ঢাকা পড়ে যেত।

তাহলেও অনেক সাহস করে এই নাটকগুলো পাঠকদের দরবারে উপস্থিত করা হল এই আশা নিয়ে যে তারা এগুলো নিবিড়ভাবে পড়ে হয়তো নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে পারবেন। যে কথা আমরা কবিতায় বলতে চাই, একজন কবি তাঁর নাটকে সেই উপলব্ধিকেই ভিন্নতর মাত্রা দিতে চান। জীবন এত বিপুল এত বিচিত্র, এত গভীর যে তাকে শুধুমাত্র একটি শিল্প আঙ্গিকে সবসময় ধরা যায় না। সে কারণেই কবি লেখেন গদ্য, লেখেন নাটক এবং তারই হাতে কখনো তুলি কলমে ফুটে ওঠে চিত্রবিচিত্র। কাব্যনাটকও সেই শিল্পেরই এক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি। তার পরীক্ষার সময় এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি নাট্যরূপ কবিতার আঙ্গিকে নতুন

ব্যঞ্জনা আনতে সক্ষম। জীবনের গভীর অতল, বিচিত্রজটিল অভিজ্ঞতা ফোটাতে কাব্যনাটক কতদূর সাফল্যলাভ করতে পারে তা এলিয়ট, লোরকা প্রমুখ কবি ও নাট্যকার তাঁদের অনুপম সৃষ্টিতে আমাদের দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষাতেও তার সম্ভাবনা বিপুল। আমার চেষ্টা সামান্য। পাঠকদের বিচারের জন্যই এগুলো সংকলনে গ্রথিত হল।

এদিকে অবশ্যই আরও অনেক পরিশ্রম এবং অনুশীলনের অবকাশ রয়েছে। অন্তত আজকের এই সন্দিগ্ধ সময়ের সাহসিক পরীক্ষা হিসেবে কাব্যনাটককে যদি আমাদের পাঠক ও দর্শকরা গ্রহণ করেন তাহলে এই নূতন রীতি আরও অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে। কবিতার পাঠক নিয়ে আধুনিক কবিরা যে-সমস্যা ও সংশয়ের মুখোমুখি হয়েছেন, কাব্যনাটকের সার্থক প্রয়োগে সেই সমস্যার একটা সমাধান আশা করা যেতে পারে। ব্যর্থতা সাময়িক, প্রারম্ভিক ত্রুটিগুলোও আমরা অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়িয়ে যাচাই করে নিতে পারবো। এ প্রসঙ্গে পাঠকরা আগ্রহী হ'লে কাব্যনাটক তার লক্ষ্য স্থির রেখে এগোতে পারবে। পাঠকের আগ্রহ এ জন্যে আকাঙ্ক্ষা করি যে আমার কাছে এবং সম্ভবত প্রত্যেক সৎ লেখকের কাছেই, শিল্পের ঈশ্বর পাঠক সাধারণ। অন্য কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি প্রতিবাদী।

কৃষ্ণ ধর

এক রাত্রির জন্য

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

এক রাত্রির জন্য

[একটি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম দেখা যাচ্ছে। সিগন্যালের লাল আলো। ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিং-এর শব্দ কানে আসে দূর থেকে। হাসির শব্দে প্ল্যাট-ফর্মকে সচকিত করে ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকল একটি তরুণ আর তরুণী। দুজনেই যাত্রী, দেখে মনে হয়। ওয়েটিং রুমের এক কোণে একটি লোক আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।]

ভাস্বতী : [হাতের ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে]
বেশ হল সুবিনয়, আজকের মত নিশ্চিন্ত !

সুবিনয় : নিশ্চিন্ত কেন ভাস্বতী ?

ভাস্বতী : যেহেতু হাতে কোনো কাজ নেই,
শুধু অপেক্ষা।
আমার কি মনে হয় জানেন ?
অপেক্ষাটাই আসল উদ্যম ;
পৌঁছানো মানে তো থেমে যাওয়া !
যাই বলুন, ভাগ্যিস ট্রেন আসেনি,
তাই আপনার সঙ্গে পরিচয় হল।

সুবিনয় : হয়তো এমনি থামবে একদিন আমাদের ট্রেন
জীবনের বিপন্ন সময়ে। কেউ কেউ রয়ে যাবো
সচকিত পান্থশালায়। অন্যসব পথিকেরা
চলে যাবে। চলে যাবে তারা যার যার ঘরে,
কেউ তাকাবে না।

ভাস্বতী : সেজন্য দুঃখ হচ্ছে ?

সুবিনয় : নিঃসঙ্গতাকে ভয় করি, আমি
নিজেকে ভুলে থাকতে চাই।

[ভাস্বতী গভীরভাবে তাকায়, সুবিনয়ের কথাটা যেন তাকে ভাবায়।]

ভাস্বতী : নিজের দিকে তাকাতে ভয় ?

সুবিনয় : না ভাস্বতী, আমি নিজের সঙ্গে
কথা বলতেই ভয় করি। আমি
তার কাছে ফিরে যেতে চাই
কিন্তু যখনই ভাবি : ফিরে যাবো ?
আঁতকে উঠি স্বগত সংলাপে :
না, না, ফিরে যাওয়া অসম্ভব,
অসম্ভব পিছু হটে, মাথা নিচু করে সব
মেনে নেওয়া !

ভাস্বতী : কিছু বুঝতে পরছিনা সুবিনয়,
সবটাই যেন হেঁয়ালী।
কোথায় ফিরে যাওয়া ? কার কাছে
ফিরে যাওয়া ?

সুবিনয় : জীবনের কাছে ?

ভাস্বতী : মস্ত বড় কথা বললেন সুবিনয়,
মস্ত বড় কথা।
জীবনের কাছে ফিরে যাওয়া,
সে তো গৌরব,
তাকে অসম্ভব মনে হয় কেন ?

সুবিনয় : সে-এক অন্য ইতিহাস, ভাস্বতী।
যা ছিল একান্ত প্রার্থিত
তাকে অসম্ভব করেছে একজন
[থেমে]
না, থাক সে কথা।

[সুবিনয় এবার এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে ফেলে দিল। পাশেই সুটকেশ খুলে বার করল কবিতার বই।]

সুবিনয় : আমরাই এখানে ভাস্বতী, শুধু আমরা দুজন

নির্জন স্টেশনে, সামনে এক প্রসারিত রাত।
ভোর ছ'টার আগে ট্রেন নেই।
কী করে সময় কাটাই?
আপত্তি না করেন যদি, কবিতা শোনাই।

ভাস্বতী: আপত্তি কিছুই নেই, কবিতা শোনান।
তবু তো ওতেই তৃপ্তি, ঘুম পাড়ানিয়া গান
মনের সংলাপ, পা ছড়িয়ে বসা যায়
দু'দণ্ড আলাপে, মনের ভিতরে।

সুবিনয়: ধন্যবাদ সৌজন্যে আপনার।
কবিতাই শান্তি শুধু, জীবনের ভোরের ভৈরবী
অথবা নদীর ঢেউ, নিয়ে যায় ভাটিয়ালী সুরে
এ হৃদয়-তীর থেকে অন্য তীরে,
সুরের ওপারে।

[বাইরে সান্টিং-এর শব্দ, একটা ছন্দের মতো, নিঃঝুম রাত্রির তন্দ্রা ভাঙ্গে। 'চাই চা' বলে ফিরিওয়ালার মন্থর সুর, সুবিনয় বই খুলে কবিতা পাঠ করে।]

যদিচ এখনও অনেক সময় বাকী,
রাত্রির চোখে নামেনি আলোর রেখা।
প্রহরে প্রহরে জেগে আছি আজো একা,
কুলায়ে ক্লান্ত নীড় ফেরা শত পাখি।

তুমি বলো সখা,কেন এত ভালবাসা,
ক্ষণবসন্তে ডেকেছো সংগোপনে।
মায়াবী হৃদয়ে দোলা দিলে আনমনে
তোমার চোখেতে অপরিচিতের ভাষা।

কথা দাও তুমি, কবে প্রতীক্ষা শেষ?
বিহঙ্গ কবে আলোর পিপাসা বুকে,
আকাশে ফিরবে মদিরেক্ষণ চোখে?
তারি পথ চেয়ে ফাল্গুন অনিমেষ।

মাধবী আসেনা, আসবেনা আমি জানি
হৃদয় প্রান্তে ব্যর্থই আনাগোনা।
মাতাল সমীরে স্বপ্নের জাল বোনা
ভ্রষ্ট লগ্নে পোহাবে বাসর রজনী।

মৃত্যুই আজ মৃত্যুই ধ্রুব সখা
যযাতি প্রাণের অনন্ত রূপ তৃষা
মেটেনা শান্তি, তৃপ্ত হয়না আশা
অতএব জানি মৃত্যুই ধ্রুব সখা।

ভাস্বতী : [বাধা দিয়ে]
দোহাই আপনার, শুনবো না সুবিনয়
সইতে পারিনা আমি।

সুবিনয় : কী সইতে পারেন না,
কবিতা, না সময়, না জীবন?

ভাস্বতী : এই মৃত্যুর কথা
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু······
জীবনে অমল আলোরা কি সব নিভে গেছে?
আলোকের গন্ধ নিয়ে পাখিরা ফেরেনি গান গেয়ে?
[একটু থেমে]
জানেন সুবিনয়,
একদিন অনেক কবিতা শুনতাম।

সুবিনয় : কার কাছে?

ভাস্বতী : না, থাক।

সুবিনয় : তবে থাক, কবিতার রাত আজ থাক।
আশ্চর্য পুলকে দুলছে আমার মন, ভাস্বতী
অঘটনে মিলে গেছি আমরা দুজন।
অপরিচয়ের বেড়া ভেঙ্গে গেল পথে যেতে যেতে
অকস্মাৎ থেমে গেল ট্রেণ, নির্জন স্টেশনে।
থেমে গেছি দুজনেই!

ভাস্বতী : থেমেই তো আছি
জীবনে চলার নেশা আর কই লাগল ?
সুবিনয় : কেন চলতে চলতেই তো এই থামা ?
ভাস্বতী : না, সুবিনয়, আমি খুঁজে পাইনে জীবনের মানে
সংশয়ের চোরাবালিতে পা দিয়ে আছি
পাইনি উত্তর।
সুবিনয় : জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়ে সুরু হল পরিচয়।
জটিলতায় কেন আড়াল করছেন নিজেকে ?
ভাস্বতী : জীবনটা আসলে জিজ্ঞাসা নয়,
জিজ্ঞাসার ভান।
সুবিনয় : মানলুম না, ভাস্বতী
জিজ্ঞাসা থেকেই বেরিয়ে আসে উত্তর।
জীবন একটাই, যদিও তা ছোট
তাকে সংশয়ের অতলে তলিয়ে কী বা লাভ ?
ভাস্বতী : তা জানিনে।
তরঙ্গ চেয়েছিলুম সুবিনয়, জীবনের ঢেউ
হাহাকারে তলিয়ে গেছি আমি।
ছুটি তাই হরিণীর মতো দেশ থেকে দেশান্তরে
কান্নার বিলাপে, শোকার্ত দিনের শেষে
রাতের গভীরে।
সুবিনয় : কান্না, কান্না, কান্না।
হায়রে জীবন, হায়রে সময়
এত কান্না কেন দিলে তুমি ?
[ভাস্বতীকে লক্ষ্য করে]
কেন এত কান্না ভাস্বতী ?
মনে হয় আমাদের জীবনের স্রোতে
কোথাও রয়েছে মিল।
প্রত্যাখ্যান ? ব্যর্থতার নির্মম বেদনা ?
সবই হতে পারে, জীবন একটি প্যাটার্ন
তার একটিই নাম—ভালবাসা

ভাস্বতী : আমি ওকথা উচ্চারণ করতে ভয় করি,
সুবিনয়।

সুবিনয় : আমিও,
প্রেমের উত্তাপ যদি নিভে গিয়ে ছাই
হয়ে যায়,
সে জীবন মৃত্যুর সমান।
[থেমে]
তবুও মানুষ বাঁচে।

ভাস্বতী : কীসে ?

সুবিনয় : মৃত্যুহীন প্রেমের স্মৃতিতে।

ভাস্বতী : এখনও বিশ্বাস আছে সুবিনয়,
মানে আছে জীবনে বাঁচার ?

সুবিনয় : তবু কিছু আছে। সব দিন ব্যর্থ নয়
সব রাত্রি আনেনা বেদনা।
কান্নার শরীর নিয়ে রাত্রি যদি শেষ হয়,
দেখা দেয় হাসিমাখা আশ্চর্য সকাল

ভাস্বতী : [ক্লান্ত স্বরে]
আমার বিশ্বাস নেই।
মনে হয় বসে আছি অন্ধকার দ্বীপে।
কোনোদিন জাগবে না আর সকালের রোদ।

সুবিনয় : ভাস্বতী !

ভাস্বতী : হ্যাঁ সুবিনয়, আলো নেই চোখে।

সুবিনয় : আমি তার আলো দেখেছি
তার সংকেত ঝলকানি দিয়ে যায় কখনো কখনো।

ভাস্বতী : সে আলো আপনার মনে।

সুবিনয় : যখন ক্লান্ত দিনের শেষে
গোধূলির রক্ত রাঙা শাড়ি-পরা আকাশের
দিকে তাকাই,
পাখিদের ঘরে ফেরার পালা যখন
গাছেরা ঘুমের আয়োজনে ব্যস্ত

আকাশে তারার ফুল ফোটে
তখন—

ভাস্বতী : তখন কী ?

সুবিনয় : তখন মনের নিভৃতে উঁকি দেয় অনেক কাহিনী,
একটি হৃদয়ের,
যে আমার চিরকালের আশ্রয়, আশ্বাস,
বিশ্বাসের প্রদীপ শিখা !

ভাস্বতী : আমি জানি এই প্রদীপ শিখার
মূল্য। তাকে বাঁচিয়ে রাখুন সযত্নে।

সুবিনয় : আমি পাগল হয়ে তাকে খুঁজি
সে ঘুমিয়ে থাকে, সাড়া দেয় না
আমি তবু অপেক্ষা করে আছি
একদিন সে জাগবে,
ডাক দেবে আমায়।

ভাস্বতী : আপনি ভাগ্যবান সুবিনয়
যে হৃদয় এমন অকরুণ, নাগাল পেলনা
আপনার হৃদয়ের, তাকে প্রশংসা করি না
সে নির্মম।

সুবিনয় : তা নয় ভাস্বতী, সে নির্মম নয়
বলবো না তাকে অকরুণ।

ভাস্বতী : আশ্চর্য হৃদয় আপনার
এর নাম অসামান্য উদারতা।

সুবিনয় : উদারতা নয়, অযোগ্যতা।
আমি তো তোকে জাগাতে পারিনি।
আমি কী দিয়ে তাকে ভোলাবো ?
ভালবাসার এমন ঐশ্বর্য ছিল না
আমার।
আমি যোগ্য হতে পারিনি
সে ভালবাসার।
হার হয়েছে আমার।

[ভাস্বতী অন্যমনস্ক হয়ে যায়। উঠে দাঁড়ায়, জানালার কাছে যায়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় সুবিনয়ের দিকে, আবার বাইরের আকাশের দিকে।]

ভাস্বতী : আমাকে ডাকবে কে? ঘুম ভাঙিয়ে
কে বলবে : ওঠো ভাস্বতী, এই তো আমি
তুমি ভাস্বর হও আমার জীবনে।
আমি তো তাকে ছুঁতেই পারলুম না।

সুবিনয় : আমি জানি সে আসবে ভাস্বতী,
যেমন আমার এই অন্তহীন প্রতীক্ষা
রঞ্জনার জন্য,
আমি আশা করে আছি
সে আসবে, একদিন আসবে!

ভাস্বতী : আপনি সার্থক হোন,
আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে সুবিনয়।
কী করে বোঝাবো আপনাকে?
অভিশাপের বোঝা বয়ে বয়ে আমি বেড়াই।
আমার সব স্বপ্ন, সব আশা
ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে গেল
তবু—

সুবিনয় : তবু কী?

ভাস্বতী : তবু তো কল্যাণকে ভুলতে পারি নি।

[খানিকক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা। কারো মুখে কথা নেই। ভাস্বতী এসে আবার বসে। সুবিনয় ঠিক তার মুখোমুখি চেয়ারে বসল। দুজনের চোখেই এক আশ্চর্য নীরব সংলাপ। সুবিনয় স্তব্ধতা ভাঙল।]

সুবিনয় : দু'দণ্ডের পরিচয়, যদি কিছু
মনে না করেন তাহলে একটা
অনুরোধ করবো।

ভাস্বতী : কী অনুরোধ?

সুবিনয় : কল্যাণের কথা বলুন।

ভাস্বতী : [দ্বিধা করে]
ভুল বুঝবেন না।
সুবিনয় : আমি বন্ধু হতে চাই
কিছুই দিতে পারবো না আমি,
তবু বন্ধুর মমতা নিয়ে শুনবো
এ জ্বালা যে আমারও মনের
[ঘুমন্ত যাত্রীটি এবার জাগল]
যাত্রী : [জড়িত স্বরে]
রাত ক'টা ?
ট্রেনের আর বিলম্ব কত,
বলতে পারেন স্যার ?
সুবিনয় : [কব্জি ঘড়ি দেখে]
রাত তো হলো অনেক
সোয়া একটা
[যাত্রীটি উঠে জিনিসপত্র গুছোতে লাগল]
ট্রেনের খবর চাইছেন ?
সে আসবে তার খেয়াল খুশিতে।
আমাদের শুধু প্রতীক্ষা
কখন ভোর হবে, ফুটবে আলো
তাই জেগে থাকা।
যাত্রী : ঘুম এলো তো জেগে থাকার প্রশ্ন।
তারা, তারা। [উঠে বসে]
সুবিনয় : ঠিকই বলেছেন আপনি
ঘুম যেন আড়ি দিয়েছে।
যাত্রী : সবই সময়ের কারসাজি
জলের স্রোতের মতো চলন্ত সময়
জীবনের নুড়ি ছুঁয়ে ঢেউ ভেঙে চলে যায়
থামে না কখনো।
অথচ আমরাই পড়ে থাকি ওয়েটিং রুমে।
আমার কথাই ধরুন না,

কখন থেকে অপেক্ষায় আছি,
কখন আসবে ট্রেন,
হ্যাঁ, জীবনের ট্রেনও বলা যায়।
কিন্তু তা আর এলো কই ?
কোথায় আবার ডিরেলড হয়েছে গাড়ি
তাই থাকো বসে।

সুবিনয় : বাস্তবিক এক এক ধৈর্যের পরীক্ষা।

যাত্রী : জরুরী কাজ ছিল কলকাতায়
ভাবছি ফিরেই যাবো,
কতো আর বসে থাকা যায় ?

[যাত্রীটি উঠে জিনিসপত্র গুছোতে লাগল]

সুবিনয় : সত্যিই ফিরবেন নাকি ?
এতক্ষণ অপেক্ষার পর ?

যাত্রী : কী আর করবো বলুন ?
জীবনে এমন কতো অপেক্ষাই, শেষ পর্যন্ত
বুঝলেন কিনা, দেবেরও নয়, ধর্মেরও নয়।
সে জন্যেই সার বুঝেছি,
জীবনে বাঁচতে হলে চাই প্র্যাকটিক্যাল মন।
ধরুন না, সারা রাত অপেক্ষার পর
যদি শুনি ট্রেন আর আসবেই না ?
তার চেয়ে চলে যাবো আসানসোল
সেখান থেকে বাসে, পৌঁছে যাবো ট্রেনের
আগেই হাওড়ার পুল।

সুবিনয় : মন্দ প্রস্তাব নয়

[যাত্রী বাইরে গিয়ে ডাকে]

যাত্রী : এই কুলি
তোল তো বাবা মালপত্রগুলি

[কুলি এসে জিনিসপত্র তুলে নিল]

যাত্রী : [সুবিনয়ের দিকে]
চললুম স্যার

নমস্কার
কীই বা লাভ এই রাত জাগার ?
তারা, তারা।   [চলে গেল]

সুবিনয় : রাত জাগার কীই বা লাভ ?
শুনলেন তো ?

ভাস্বতী : কত রাত গেছে এই জাগরণে !

সুবিনয় : সুখী এই প্র্যাকটিক্যাল মানুষগুলি
প্রবৃত্তির সহজাতগুণে ওরা চলে।
হৃদয় নামক বস্তুটি থাকে চাপা দেওয়া।

ভাস্বতী : কল্যাণ বলতো,
হৃদয় থাকলেই মানুষ ধরা পড়ে।
সত্যি সুবিনয়, আমি ভীষণভাবে
ধরা পড়ে গিয়েছিলাম,
এমন বাঁধন, তাকে ছিঁড়ি
সাধ্য ছিল না।

সুবিনয় : তোমার কথা কিছু বলা হয়নি।
কিছু বলো
আমি যে শুনবো বলে বসে আছি।

ভাস্বতী : [চোখের কোণে জল টলমল]
ভুল বুঝবেন না আমায়,
পৃথিবী আমাকে ভুল বুঝেছে।
আত্মীয় স্বজন এবং সমাজ।
ঘৃণায়, উপেক্ষায়, উপহাসে জর্জরিত আমি
কিন্তু……

সুবিনয় : থামলে কেন ?   বলো
ঘৃণা নয়, উপেক্ষা নয়, উপহাস নয়
আমি বন্ধুর মমতায় সব শুনবো।

ভাস্বতী : [সুবিনয়ের হাত ধরে]
তুমি অন্ততঃ বিশ্বাস করো, সুবিনয়।
বিশ্বাস করো, আমি কোনো অপরাধ করিনি

আমি নিষ্পাপ।

[আবেগে ভাস্বতীর কণ্ঠরুদ্ধ]

সুবিনয় : তুমি সংকোচ করো না ভাস্বতী।

আমি তোমাকে বুঝবো,

বন্ধু হবো আমি।

[সুবিনয়ের হাতে মাথা রাখে ভাস্বতী। সুবিনয় অপলকে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে]

ভাস্বতী : [মাথা নিচু করে]

যে-আমার স্বামী হল

তাকে আমি গ্রহণ করতে পারিনি,

এই আমার অপরাধ।

বিশ্বাস করো সুবিনয়,

আমি ভুল করেছিলাম

আমি কিছু জানতুম না,

কিছু জানতুম না।

সুবিনয় : বলো ভাস্বতী, আমি শুনছি

আমাকে বিশ্বস করতে পারো।

ভাস্বতী : ফুলশয্যার রাত,

চোখেও সেদিন স্বপ্ন ছিল ফুলের,

স্বপ্ন ছিল,

অনেক স্বপ্ন ছিল।

সুবিনয় : স্বপ্ন আছে বলেই তো জীবন।

ভাস্বতী : আমার স্বপ্নের ফুল সেদিন

কে যেন পায়ে দলে চলে গেল।

প্রত্যেক নারীর কাছে যে-রাত স্মরণীয়

পরিচয়-অপরিচয়ের সেই মোহমদির লগ্নে

সে জানালো

না—না, সুবিনয়,

গলা কাঁপছে আমার, বুকের ওপর

স্মৃতির সেই দুঃসহ পাথর

[উঠে দাঁড়ায়]

সুবিনয় ঃ বিচলিত হয়োনা ভাস্বতী,
স্মৃতিগুলিই জীবনের এক একটি
অন্তহীন শিকড়,
তাকে উপড়ে ফেলা যায়না
তুমিও স্থির হও।
[ধরে বসিয়ে দেয়]
ভাস্বতী ঃ সে বললে ঃ
[আবহকণ্ঠে]
আমায় ক্ষমা করো, ভাস্বতী
ক্ষমা করো,
ভাস্বতী ঃ কী বলছো তুমি
ক্ষমার প্রশ্ন কেন ?
[আবহকণ্ঠে]
ক্ষমা করো আমার অতীতকে
আমি বিবাহিত
[যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনা]
সুবিনয় ঃ বিবাহিত ?
ভাস্বতী ঃ বললে,
[আবহকণ্ঠে]
ছোটেবেলায় বিয়ে দিয়েছিল
বাপ মা। যে বালিকা হৃদয় ছিল
খেলনা, তার নাগাল পাই নি
কোনোদিন,
থাকে দূরে, আমার জীবনের বাইরে
একা।
কোনোদিন আসবে না, কোনোদিন না
আমরা নূতন জীবন গড়বো
তুমি কথা দাও, ক্ষমা করলে।
সুবিনয় ঃ স্কাউণ্ড্রেল।
ভাস্বতী ঃ কোনো কথা বলিনি আমি।

কেঁদেছি সারা রাত। আকাশ তার সাক্ষী
নির্বাক তারাগুলি নীরব চোখে
জানিয়েছে সমবেদনা।

সুবিনয় : তুমি কী করলে ?

ভাস্বতী : ভোর হতেই চলে এসেছি।
আর যাই নি।
জীবনে দ্বিতীয়বার তার মুখ দেখি নি।

সুবিনয় : এমন কেন হলো ভাস্বতী ?
তুমি ওকে ভালবাসতে ?

ভাস্বতী : না। আমি চিনতুমই না
দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলুম কল্যাণের
আমার প্রথম ও শেষ ভালবাসা।
কল্যাণ আসেনি,
ক্ষোভে, বেদনায়, অভিমানে তার অবহেলার
ওপর শোধ নিতে রাজি হয়েছিলুম
এই বিয়েতে।
তার এই পরিণাম।

সুবিনয় : তোমার কী চাওয়া ভাস্বতী ?

ভাস্বতী : ফিরে যেতে চাই আমি
আমার ভালবাসার কাছে।
বাঁচতে চাই, ভালবাসতে চাই…
কল্যাণ আমার এই তাপদগ্ধ জীবনে
আবার যদি আসে বর্ষার মেঘের মতো
আমি সেই ধারাস্নানে পবিত্র হবো।

[নিস্তব্ধতা। কারো মুখে কথা নেই। সুবিনয় উঠে দাঁড়ায় ; পায়চারি করে। গভীর বিষণ্ণতা তার চোখে-মুখে।]

সুবিনয় : কী আশ্চর্য রাত, আশ্চর্য যাত্রা
আশ্চর্যভাবে তোমার সঙ্গে পরিচয়।
আমি বিহ্বল হয়ে গেছি ভাস্বতী

মনে হচ্ছে এক অবিশ্বাস্য রাত।
তুমি বলো ভাস্বতী, কোথায় তোমার কল্যাণ ?
আমি তাকে খুঁজে বার করবো।
হাত ধরে বলবো : তোমার ভাস্বতীকে
গ্রহণ করো, তার কোনো পাপ নেই।
নদী যেমন কারো স্পর্শে মলিন হয় না
লুব্ধ কামনার কোনো ক্ষতই
আহত করতে পারে নি তাঁর হৃদয়,
তুমি তাঁকে গ্রহণ করো কল্যাণ।

ভাস্বতী : পারবে সুবিনয়, পারবে তুমি ?
আমার আট বছরের খোঁজা।
জেনেছি সে থাকে এখানেই।
কাছের এক শহরে,
তাই ছুটে আসা।
আমি চোখের জলে
তার কাছে ক্ষমা চাইবো।
বলবো : আমায় ক্ষমা করো
আমায় পূর্ণ করো কল্যাণ
তোমার ভাস্বতীকে এ-জীবনের
আলোকে বাঁচতে দাও।

সুবিনয় : আমি যাবো ভাস্বতী

[স্টেশন মাস্টারের প্রবেশ]

স্টেশন মাস্টার : নমস্কার, বিরক্ত করতে এলুম।
আপনারা যাবেন কতদূর ?
গাড়ি তো খুবই আনসার্টেন
কখন আসবে কোনো খবর পাইনি।

সুবিনয় : কোনো খবর নেই ?
আশ্চর্য,
কোথাও কোনো অ্যাকসিডেন্ট !

স্টেশন মাস্টার : না তেমন কিছু নয়।

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যাওয়া,
রোজই তো আসে,
একদিন দেখছে দেরী করলে
কেমন হয় ?

[উচ্চ ও সরল হাস্য]

সুবিনয় : ভারী মজার ব্যাপার

স্টেশন মাস্টার : আপনারা, মা-লক্ষ্মী সারারাত
ওয়েটিং রুমে কাটাবেন ? এই শীতে ।
তার চেয়ে, যদি আপত্তি না থাকে
আসুন না আমার কোয়ার্টারে
আমি এখানকার স্টেশন মাস্টার
থাকি পাশেই,
কোনো অসুবিধা হবে না ।

[সুবিনয় ও ভাস্বতী মুখ চাওয়া চাওয়ি করল]

সুবিনয় : ধন্যবাদ, সৌজন্যে আপনার
রাত তো ফিকে হয়ে মিশে যাবে
ভোরের গলানো রোদে ।
আজ আর যাবো না ভাবছি ।
এখানেই রয়েছে বন্ধুর বাড়ি,
সকালে দেখা করেই ফিরবো ।
কী বলো ভাস্বতী !

ভাস্বতী : খুব ভালো লাগছে আপনাদের
ওয়েটিং রুম,
প্রতীক্ষার জন্য এর চেয়ে সুন্দর
জায়গা আর কী হতে পারে ।
বেশ ভাল,
মিছি মিছি রাতে গিয়ে
কষ্ট দেওয়া ।

স্টেশন মাস্টার : কষ্ট কিছু নয় । এই তো এখানে থাকি নিঃসঙ্গতার
অতল সমুদ্রে । ট্রেন গুণি, যাত্রী দেখি,

মানুষের চলন্ত মিছিল। সব চলে যায়···
শুধু এই নির্জন স্টেশনে আমরাই
জ্বালিয়ে রাখি ডিসট্যান্ট সিগন্যাল
চলার ইশারা।

সুবিনয়ঃ খুবই নিঃসঙ্গ লাগে?
রোজ কত নূতন মুখ দেখেন,
কত দূরের প্রশ্ন নিয়ে ওরা আসে
তবুও—

ভাস্বতীঃ আপনার সহৃদয়তা অতুলনীয়।
সব কিছু ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক
শুধু থাকে সৌহার্দের স্মৃতি-ঘেরা ক্ষণটুকু
সেই স্মৃতি অক্ষয় হোক মাস্টার বাবু।

স্টেশন মাস্টারঃ সুন্দর, কথা বলো তুমি,
তোমাকে আর আপনি বলছিনা।
তোমাকে দেখে আমার তার
কথা মনে পড়ছে—
মানসীর কথা।

[গলাটা ভিজে এল]

মানসী, আমার নয়নের মণি,
বুকের ধন, আমার একমাত্র মেয়ে।
আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে

[বলতে বলতে কথা আটকে যায়]

ভাস্বতীঃ আপনি স্থির হোন মাস্টার বাবু।

সুবিনয়ঃ আপনি বসুন।

স্টেশন মাস্টারঃ আমি ভুলে থাকতে চাই বেদনা।
পারিনা, এই নিঃসঙ্গতায় বেঁচে থাকতে।
তোমাদের মতো সঙ্গী পেলে
আমি দু'দণ্ড সব ভুলে থাকি।
মানুষকে ভালবাসার জন্যেই তো এত দুঃখ
ভালবাসা মানুষের শত্রু

তাকে কাঁদায়, তাকে রিক্ত করে।

ভাস্বতী : তবু, মাস্টার বাবু, মানুষ ভালবাসে
স্বপ্ন দেখে, জয় করতে চায় মৃত্যুকে
ভালবাসা দিয়ে।
গ্রহের আবর্তনে, চন্দ্র সূর্যে, আকাশের
তারার আলোয়, একই কথা উচ্চারিত :
আমরা বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই
চিরকালের মানুষের মনে।

সুবিনয় : এই কামনাই পৃথিবীর আদিকথা।

স্টেশন মাস্টার : আকাঙ্ক্ষার দ্বীপে বসে
আমরা সময়ের স্রোতের ঢেউ গুণি।
তার ফেনিল উচ্ছ্বাস জীবনের
তীর ছুঁয়ে চলে যায় সমুদ্রের দিকে।
যাক সে কথা, আমি আসি।
জরুরী তার করতে হবে সদর দপ্তরে।
দরকার হলেই ডাকবে,
রয়েছি কাছেই।

[চলে গেল]

সুবিনয় : তুমি শ্রান্ত ভাস্বতী, খানিক বিশ্রাম করো।

ভাস্বতী : আর তুমি ?

সুবিনয় : ভয় নেই, রাত-জাগা অভ্যেস আছে।
অনেক রাত পার হয়ে এসেছি।
তুমি ঘুমাও,
আমি বাকী রাতটুকু
আকাশের রঙ ফেরা দেখবো।

ভাস্বতী : ঘুম আমার আসবে না সুবিনয়,
যে-ঘুম শান্তির, আমার চোখ থেকে
সে-আজ পলাতক আট বছর।
আমি আর তাকে ডাকবো না—
আমি জাগরণেই তাকে চাই,

আমার অজানতে সে যেন আর
পালিয়ে যেতে না পারে।

সুবিনয় : পাগলামি করোনা ভাস্বতী,
তুমি ঘুমোও,
প্রশান্তির নিদ্রা জড়ো হোক তোমার দুচোখে।
আমি প্রার্থনা করি ততক্ষণ
যে-সকালের পায়ের শব্দ শোনা যায়
তারায় তারায়
সে যেন আসে প্রত্যয়ের তাপ নিয়ে
জীবন ভরায়…
আমি রাত জাগি।

[আলোটা কমিয়ে দেয় সুবিনয়। বাইরে থেকে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়ে। সুবিনয় বারান্দায় পায়চারি করে। ভাস্বতী ক্লান্তভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। এক অর্থহীন দূরায়ত দৃষ্টি তার চোখে। লণ্ঠন হাতে রতনের প্রবেশ।]

সুবিনয় : কে ?

রতন : আমি রতন পয়েণ্টসম্যান,
মাস্টারবাবু পাঠালেন,
কিছু প্রয়োজন যদি হয় বলবেন।
মাস্টারবাবু তো আপন ভোলা
একেবারে মাটির মানুষ।
তার ওপর, দিদিমণি স্বর্গে যাবার পর থেকে
কেমন জানি হয়ে গেলেন।
সব সময় সব কিছু মনে রাখতে পারেন না।
আমি তাই ওঁর পায়ে পায়ে থাকি।

[থেমে]

আপনাদের বিছানাগুলো
পেতে দিয়ে যাই।

সুবিনয় : না, না, থাক রতন

কিছুই দরকার হবে না।
তুমি বরং জল দাও একগ্লাস,
রাত জেগে পিপাসায় গলা শুকিয়ে কাঠ।

রতন : এই আনছি বাবু।

[চলে গেল]

ভাস্বতী : কি এক আশ্চর্য মানুষ,
পথের প্রান্তে কত বিস্ময় জমা হয়ে থ কে !
মমতায় অনাবিল মন
অথচ কী নিদারুণ শোকে জর্জরিত,
জীবনের পরিহাস কতো ভাবে বিদ্ধ করে
অসহায় মানুষেরে !

সুবিনয় : তবুও মানুষ অপরিমেয়, শক্তিমান সে
শোক, তাপ, দুঃখ, ভয় সবার উপরে
মানুষের অমৃত প্রেম,
যার কাছে মৃত্যুও নতজানু।
অবিনশ্বর এক স্বপ্ন, সত্যের তোরণে
বার বার মৃত্যু ফিরে যায়
নির্বাক বিস্ময়ে।

ভাস্বতী : আমার ভয় কাটে না সুবিনয়।
চিরকালের ভয়ে বন্দিনী আমি।
সে অমৃতের স্বাদ আর পেলাম কোথায় ?
ভীষণ ভয়ে থাকি।

সুবিনয় : তুমি ঘুমোও নির্ভয়ে,
আমি আছি, জেগে আছি
এই দু'টি বাহুর আড়ালে
তোমাকে আশ্রয় দেবো।

[রতন জল নিয়ে ঢোকে]

রতন : বাবু নিন জল।

[সুবিনয় জলের গ্লাস নিয়ে বারান্দার দিকে যায়]

আপনি শুয়ে পড়ুন দিদিমণি,

পায়ে পায়ে রাত তো কম হয়নি।

ভাস্বতী : ঘুম আর হবে না রতন,
শুধু শুধু এতো আয়োজন।

রতন : সে কি বলো দিদিমণি।
এখনো দু পহর রাত বাকী,
পোহাতি তারা নেভেনি এখনো
মহানিমের ডালে এখনো চাঁদ,
এখন তো রাত নিশুতি
'দানাপুর' গেলে তবে ফুটবে আকাশের চোখ
পাখ পাখালির ডাকে
তখন আপনিই জেগে উঠবে।

ভাস্বতী : তুমি কদিন আছো এখানে রতন,
কাজ কতদিনের ?

রতন : সে অনেক দিন হলো।
এখান থেকে খানিক দূরে
অঞ্জনপুরের গাঁয়ে আমার বাড়ি।
কাজ ! তা হলো অনেক দিন,
লেখা-জোখা কী আর আছে ?
দশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছিলুম,
এখন তিন কুড়ি হলো মাইনে
হিসেব করে লও।

ভাস্বতী : [হেসে]
বেশ হিসেব দেখালে !
আচ্ছা রতন, তোমার কে আছে !

রতন : আমার কেউ নেই গো দিদিমণি।
বুড়ী মা ছিলেন, এখন স্বর্গে
বাস্, আমি একা,
থাকি মাস্টারবাবুর সঙ্গে।
কোনো চিন্তা করিনে
একা মানুষের আর চিন্তা কি গো !

ভাস্বতী ঃ এখানে তোমার ভাল লাগে
কোনো চাওয়া নেই ? কোনো অতৃপ্তি ?

রতন ঃ কিছুই তো পাইনি দিদিমণি,
শুধু মাস্টার বাবুর ভালবাসাটুকু ছাড়া।
আর কি-ই বা চাওয়া থাকবে আমার ?

ভাস্বতী ঃ ভালবাসার আরও অন্য চেহারাও তো
আছে, কখনো তা স্নেহ, কখনো প্রবল
আকর্ষণ, কখনো মমতা···

রতন ঃ আমরা কি অত শত বুঝি দিদিমণি ?
ঘুরে ফিরে মায়ের ভালবাসার কথাই
মনে পড়ে, মাস্টারবাবু আমাদের
মাতাপিতা দুজনেই।
এই বুঝি ভালবাসা।

ভাস্বতী ঃ ঠিক বলেছো রতন,
এরই নাম ভালবাসা, কোনো কিছু
প্রতিদান না চেয়ে যে-দেওয়া,
তারই নাম ভালবাসা,
আর সব মেকী।

রতন ঃ সব মেকীর টানে চলে,
আসলের খোঁজ পায় না বলে।

ভাস্বতী ঃ [কথার মোড় ঘোরায়]
বেশ সুন্দর জায়গাটা তোমাদের রতন,
নীরব, নিথর, এক ছিমছাম ছোট্ট শহর,
বেশ লাগে।
এ শহরে শান্তি আছে,
কী বলো রতন ?

রতন ঃ অতশত বুঝিনে গো, দিদিমণি।
তবে কলকাতার মতো নয়, এটা ঠিক মানি।
আমি গেছিনু সেবার পুজোয়,
আপনাদের ওই কলকাতায়।

কাতারে কাতারে জন,
চলন্ত মানুষে বোঝাই গাড়ি
পালাই পালাই করে ফিরে আসি বাড়ি
মানুষ হারিয়ে যায়। এমন আজব শহর কলকাতা
আটঘাট জানা নেই, কখন কী কথা
কাকে বলে ফেলি ?
সে এক বিপত্তি ঘটে, দিদিমণি বলি।

ভাস্বতী : [হেসে]
এত ভয় বাপু তোমার,
আসল চেহারা দেখোনি রতন, কলকাতার।
কলকাতা অনেক বড়ো
জীবন ভাঙতেও পারো
গড়লে গড়ো।

রতন : এই যা বলেছেন দিদিমণি
খাঁটি কথা বড়ো
জীবন ভাঙতেও পারো, গড়লে গড়ো
[থেমে]
এখন তাহলে ওদিকে যাই একবার
মাস্টার বাবু হয়তো করছেন ঘর বার।
[রতন চলে যায়। ঘরে ঢোকে সুবিনয়]

সুবিনয় : এখনো ঘুমোও নি ?

ভাস্বতী : ঘুম আর আসবে না,
রাতের রেলগাড়ির মতোই
ঘুম আজ কোথায় উধাও।

সুবিনয় : কি সুন্দর রাত ?
মনে হয় শুক্লা কোনো তিথি।
এক রাত্রির জন্য আমরা অতিথি।
কী আশ্চর্য জীবনের গতি,
চকিত অভাবনীয় ঘটনায় ঘটনায়
কখনো জটিল, কখনো বা

উদ্দাম উচ্ছল।
কোনো দিন কি ভেবেছি
এমনি এক নির্জন স্টেশনে
দেখা হবে তোমার সঙ্গে!
জীবনের গতি সত্যি দুর্নিবার,
অন্ধ এক অদৃশ্য শক্তির টানে
জীবনের বিচ্ছিন্ন মাটি থেকে
অপরিচয়ের নদী বেয়ে ঠিক
মিলে গেছি।
অথচ আজকের রাতটাও সত্য
সত্য সেই না-জানা অতীত।

ভাস্বতী: সবই সত্য মানি, তবু যেন
আশংকায় দুরু দুরু বুক
কী হবে, কী হবে? যাকে খুঁজি আমি
আমাকে কি সে কখনো ফের ডেকে নেবে?
ব্যাকুল আকাশে মেশে কতো দীর্ঘশ্বাস,
সত্য হবে সেই? স্বপ্ন সত্য হবে?

সুবিনয়: স্বপ্নকে সত্য বলে বিশ্বাস রাখো।

ভাস্বতী: বিশ্বাসের ভিত্তিতে ধরেছে চিড়,
সময়ের নির্মম প্রাচীর
হয়তো বা মুছে দিয়ে গেছে
আঠারো বসন্তে যা সত্য ছিল।

সুবিনয়: জীবন ভোলে না কিছু, সব মনে রাখে
ক্ষণটুকু রয়ে যায় চিরকাল স্মৃতির কোঠায়,
সময় প্রলেপ দেয়, তবুও ভোলে না।

ভাস্বতী: কী তবে দিয়েছি আমি; শান্তি কিংবা
সান্ত্বনা মুহূর্তের জন্য, তাও নয়। নইলে
এমনভাবে ব্যর্থ করে আমার যৌবন
ভুলে সে থাকতো না, ভুলে রয়েছে কী করে?

সুবিনয়: সময় ভোলে না কিছু, সব মনে রাখে।

ভাস্বতী ঃ তখনো সময় হয়নি, বলেছিল ঃ
থেকো প্রতীক্ষায়, ডাক দেবো আমি
থেকো প্রতীক্ষায়।
তারপরই হারিয়ে গেল, জনারণ্যে, কোলাহলে
মিশে গেল, পাইনি ঠিকানা।
ভেবেছি আমারই ভুল,
ভালবাসায় আমি তাকে ভোলাতে পারিনি,
তাই আমার যৌবন কেঁদেছে অঝোরে
নির্বাক রাত্রিতে, অপমানে অভিমানে
পাইনি উত্তর।
[স্বগত]
তোমার হয় নি সময়
বলে গেলে, থেকো অপেক্ষায়,
বঞ্চনায় রেখে গেলে, আমাকে কী দিলে ?
মুহূর্তের সেই ভুলে,
অভিমানে কী অতল অন্ধকারে
চলে গেছি, তোমার ভাস্বতী
কী দারুণ ভুলের আগুনে দগ্ধ হলো।
ফিরে এল একরাশ কান্না আর
অপমান নিয়ে, তবুও এলেনা।
[সুবিনয়ের দিকে ফিরে]
সুবিনয়, তুমি বলো তাকে আমি
ফিরে পাবো কিনা ?
একদিন যারে ভালো লেগেছিল
আঠারো বসন্তে যারে চেয়েছিল
কান্নার মর্মর তুলে
বসন্তের শেষে সে যদি দুয়ারে আসে
খুলবে কি, খুলবে কি দ্বার ?
সুবিনয় ঃ খুলবে না! কেন তবে এত আশা
মানুষের ? কেন এত আকাঙ্ক্ষার

আলো আকাশে তারার চোখে ?
প্রেমই মৌল সত্য, প্রাণের গভীরতর কথা,
তার চেয়ে বড় নেই ।
সময়ের খরস্রোতে সব ভেসে যায়
শুধু থাকে মানুষের প্রেম, আলো ।

ভাস্বতী : আমার বিশ্বাস নেই সুবিনয়,
মনটা ভীরু হরিণীর মতো
এখনো পালিয়ে বেড়ায়,
হৃদয়ের আনাচে কানাচে, গভীর অরণ্যে
রাত্রির শরীরে একটি কি দুটি আলো
হাতছানি দিয়ে ডাকে ।
ভয়ে ভয়ে থাকি, কখন আবার তীর বিদ্ধ হয়ে
ফিরে আসতে হয় । যে ফুল ঝরেছে ঝড়ে
কিংবা অনাদরে, উপেক্ষার শীতল রাত্রিতে
বসন্তের শেষে, কী করে ফোটাবে তারে ?

সুবিনয় : কেন ফুটবেনা ফুল ? রাত্রির শিশিরে
ঘুমন্ত পদ্মের চোখ জেগে ওঠে সকালের
রোদে । আমার কথা ভাবো ভাস্বতী
কী নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে জর্জরিত আমার মন !

ভাস্বতী : [আকুলতা নিয়ে]
সুবিনয় ।

সুবিনয় : হ্যাঁ ভাস্বতী, রঞ্জনার প্রেমে একদিন
জীবনের মানে নতুন ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল ।
বলেছি, রঞ্জনা তুমি ভালোবাসা দিয়েছো আমায়
তাতেই কৃতার্থ আমি, আর কিছু চাইবো না ।

ভাস্বতী : তুমি অসাধারণ, সুবিনয় ।

সুবিনয় : অতি সাধারণ আমি, সামান্য সে-চাওয়া
বলেছি, যেদিন ডাকবে তুমি জীবনের দক্ষিণ হাওয়ায়
সে দিনই আসবো আমি, ধন্য হতে তোমার সে প্রেমে ।

ভাস্বতী : তুমি পবিত্র সুবিনয় ।

সুবিনয় ঃ আজও আমি আছি প্রতীক্ষায়,
ডাকেনি, ডাকেনি সে, চলে গেছে সাগরের পারে।
ভাস্বতী ঃ কী নিদারুণ প্রবঞ্চনা।
সুবিনয় ঃ প্রত্যাশা ও প্রবঞ্চনা দিয়েই তৈরী
আমাদের জীবন।
সবচেয়ে যাকে ভালবাসি, তাকে রাখি
আড়াল করে,
যখন সময় হয় তখন সে ডাক দেয়।
মরুতীর, শ্যামলিমা……
সব পার হয়ে তখনি সে আসে।
ভাস্বতী ঃ এত গভীর বিশ্বাস তোমার সুবিনয়
তোমাকে ঈশ্বরের মতো মনে হয়।
সুবিনয় ঃ [হেসে]
দোহাই তোমার, সমতলে আছি,
উঁচু আসনে বসিয়ে বিদায় দিয়োনা।
ভাস্বতী ঃ না, না সুবিনয়, আমি ভাবছি
আমার নিজের কথা।
এমনি বিশ্বাস নিয়ে আমিও অপেক্ষা করেছিলাম
কতো বসন্তে পথ চেয়ে গেছে দিন।
রাত্রিতে ভাবি সকালে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি
ব্যর্থ প্রতীক্ষায় দিন যায়। কখনো বা ভাবি
সন্ধ্যার মমতাময় আকাশের তলে পাবো তাকে,
তাও ব্যর্থ হয়।
প্রত্যাশার ঢেউ ভাঙে,
আমি কাঁদি, সুবিনয়।
[চোখ ছল ছল করে ওঠে ভাস্বতীর। অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকে সুবিনয়। চা নিয়ে আসে রতন।]
রতন ঃ আমি জানি দিদিমণি ঘুমুবেন না
তাই তো নিয়ে এলাম চা।
ভাস্বতী ঃ চমৎকার; তুমি খাসা মানুষ রতন।

সুবিনয় ঃ ওকেই বোধ হয় বলা যায় অরূপ রতন।

[দুজনেই হাসে। গম্ভীর আবহাওয়া খানিকটা হাল্কা হয়।]

রতন ঃ এই কথাটি শুনেছিলেম বটে
ভুবনডাঙ্গার মেলায়, নবনী বাউলের গলায়,
"আমার গুরু যিনি তার রূপ নাই গো
অরূপ হয়ে দেন যে ধরা"—

[বলতে বলতে টেবিলের ওপর ট্রে রাখল। ভাস্বতী উঠে গিয়ে চা তৈরী করতে লাগল। চা তৈরী হলে ভাস্বতী এক পেয়ালা সুবিনয়ের হাতে দেয়। এক পেয়ালা নিজে তুলে নেয়।]

সুবিনয় ঃ [চায়ের চুমুক দিয়ে]

এই যে বললে তুমি রতন,
অরূপ হয়ে দেন যে ধরা—
আজ যেন চায়ের পেয়ালার রূপ ধরে
সেই ভালবাসাটুকু এলো তোমার হাত দিয়ে।

রতন ঃ আমরা খেটে-খাওয়া মানুষ,
বিদ্যে নেই পেটে।
যতদিন বাঁচি বাঁচাবো খেটে।
সামর্থ্য তো নেই কিছু
মন চায় মানুষকে খুশি করি
যতটুকু সাধ্য, সেবা করি।

[রতন চায়ের পাত্র নিয়ে চলে যায়]

সুবিনয় ঃ জীবনের পেয়ালায় যতদিন থাকে উত্তাপ
ততদিন ভুলে থাকি বেদনার ভাষা
তখন সবই ভালো। দুঃখেও আমরা অটল,
উত্তাপ নিভে গেলে নামে প্রাণে শ্রাবণের ঢল।
সে-বন্যায় ভেসে গিয়ে হৃদয় তখন
এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ
চারদিকে জল, দুস্তর কান্নার ঢেউ।

ভাস্বতী ঃ আর কান্নার কথা বলো না সুবিনয়,
আমি ভীষণ ক্লান্ত,
ভীষণ পরাজিত মনে হচ্ছে নিজেকে।

সুবিনয় ঃ না না, আমারি ভুল হয়েছে।
তুমি এবার শুয়ে পড়ো।
অনেক রাত হয়েছে, জাগরণেই ক্লান্তি।

ভাস্বতী ঃ ঘুম তো দিয়েছে আড়ি
তুমি জানো।

সুবিনয় ঃ তবু, তুমি চোখ বুজে পড়ে থাকো
হয়তো আসবে ঘুম।

[ভাস্বতী চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল। সুবিনয় পায়চারি করতে লাগল বারান্দায়। সিগারেট ধরালো। নিঃশব্দ রাত্রির এক অপার নির্জন নৈঃশব্দ। দূর থেকে খুব ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসে। সুবিনয় এবার এসে বসল চেয়ারে। ঘুমন্ত ভাস্বতীর কাছটিতে। ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাস্বতীর ঘুম-সুন্দর মুখখানির দিকে। আলোটা তির্যক হয়ে ভাস্বতীর চোখে মুখে পড়েছে। এবার সুবিনয় উঠে গিয়ে আলোটা কমিয়ে দেয়। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটা ধুইয়ে দিয়ে গেল। এবার আলো আঁধারিতে ভাস্বতীকে অপূর্ব রহস্যময়ী মনে হচ্ছে। সুবিনয় উঠে দাঁড়িয়ে জানালার ধারে যায়। আকাশের দিকে তাকায়। আবার ভাস্বতীর দিকে। অস্পষ্ট অন্ধকারে সুবিনয়ের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে ভেসে আসে।]

সুবিনয় ঃ এতটুকু জীবনের কতো বড় আশা
আশা ভেঙে যায়, তৃষ্ণা মেটে না
জীবনের সব চাওয়াই ভুল,
কী যে চাই, আর কী যে চাই না
মেলে না ঠিকানা।
আমার তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে এক অঞ্জলি জলের প্রার্থনা

তাও মিলবে না।
হে জীবন, তবে তুমি কী দিলে আমায় ?
হে রাত্রি তুমি ভীষণ সুন্দর
কোমল অন্ধকারে তুমি আমায় আচ্ছন্ন করেছো
আমারই মতো ভাস্বতীকেও।
তুমি জেগো না ভাস্বতী,
ঘুমের আড়ালে তোমায় দেখি
আমি তৃপ্ত হই।
তোমার দর্পণে আমি নিজেকে দেখি,
তৃপ্ত হই, তৃষ্ণা মেটে
তুমি অনেক, অনেক রাত ঘুমোও
যতক্ষণ না ভোরের আলো ফোটে, ঘুমোও।

[দরজার দিকে তাকিয়ে]

কে ?

[স্টেশন মাষ্টারের প্রবেশ]

স্টেশন মাস্টার : আপনি এখনো জেগে ?

সুবিনয় : এলো না রাতের রেল গাড়ি
ঘুম তাই দিয়েছে আড়ি।

[দুজনের হাসিতে স্তব্ধতা তরল হয়]

স্টেশন মাস্টার : যাই হোক, মা আমার ঘুমে অচেতন
বাস্তবিক, সময় যেন আর এগোতে চায় না
খুবই দুঃসহ মনে হয়
আমরা যতই তার পায়ে ঘড়ির কাঁটার
বেড়ি পরাই না কেন, সময় ঠিক চলে যায়।

সুবিনয় : নদীর স্রোতের মতন
ফিরেও দেখে না।

স্টেশন মাস্টার : আমরা দেখেও দেখি না
হ্যাঁ ভাল কথা, চা পাঠিয়েছিলাম, পেয়েছেন ?

সুবিনয় : ধন্যবাদ, সৌজন্যে আপনার, আর রতনের সেবায়
নিঃসঙ্গ সময়টুকু প্রীতি দিয়ে ভরা থাক আজ

ভাস্বতী ভীষণ ক্লান্ত, প্রতীক্ষায় কত রাত গেল

স্টেশন মাস্টার : sleep, sleep, my lady
তুমি ঘুমোও, নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে
প্রশান্তির পেয়ালায় তোমার সময়
ভরে থাক।

সুবিনয় : যতক্ষণ ঘুমোবে ভুলে থাকবে যন্ত্রণা
নির্মম দিনের কাহিনীরা নিস্তরঙ্গ নদীর
মত স্থির হয়ে তলিয়ে যাবে।

স্টেশন মাস্টার : ও ঘুমুক

সুবিনয় : আমিই ওকে ঘুমুতে বলেছি মাষ্টার বাবু
ওর জীবনে এক সুগভীর বঞ্চনা—
এসেছে কল্যাণের খোঁজে।

স্টেশন মাস্টার : কল্যাণ!

সুবিনয় : হ্যাঁ মাস্টার বাবু,
ওর জন্যই তো এই রাত জাগা
জীবনের সবটুকু দিয়ে চেয়েছিল যাকে
তাকে সে আজও পায়নি,
তবুও প্রতীক্ষা শেষ হয় নি, দেশ থেকে
দেশান্তরে খুঁজে আজ ছুটে এসেছে এখানে।
ওকে যে পেতেই হবে।

স্টেশন মাস্টার : পাবে, আমার মন বলছে পাবে
আহা, ঠিক আমার মেয়ের মতন।

সুবিনয় : আমার সঙ্গে ক্ষণিকের পরিচয়,
আমি সুবিনয়, ভাস্বতীর বন্ধু
লতার মতন আমাকে আশ্রয় করেছে
শাখায় শাখায় তার ব্যগ্র হাত জড়ানো
শুধু ওই আলোকের জন্য,
সে এক আশ্চর্য মন, অপূর্ব অনন্য।

স্টেশন মাস্টার : অপূর্ব! তুমি ঠিকই বলেছো, সুবিনয়
কতটুকু আশা! তাও যদি পূর্ণ না হয়

তবে এ নির্মম জীবনে কী নিয়ে মানুষ বাঁচে,
কী নিয়ে, কী নিয়ে ?
অথচ সব কিছুই তো পূর্ণ হয়, সুবিনয়,
ফুল ফোটে আলো নিয়ে,
চঞ্চল পাখিরা আকাশের বুকে সুর তোলে
আনন্দের। নদী চলে উচ্ছল কল্লোলে
সাগরের খোঁজে।
শুধু মানুষের মনে কেন কান্না জমে থাকে,
কে দেবে উত্তর ?

সুবিনয় : সেই উত্তর সবাই খুঁজি আমরা, মাষ্টারবাবু
আমি প্রার্থনা জানি না, জানি শুধু প্রত্যয়।
বিশ্বাসের সেতু দিয়ে পার হবো
কান্নার এ নদী।
তাহলেই পাওয়া যাবে, রাতের ওপারে দিন
দিনের চূড়াতে আলো।

স্টেশন মাস্টার : তাই হোক সুবিনয়, তাই হোক
আমার প্রার্থনা তোমার প্রত্যয়ে মিশে যাক
নতুন সঙ্গীত হয়ে, সুরে সুরে বসন্তে পঞ্চমে
হৃদয়কে ভরে দিক।

[চলে গেল। সুবিনয় পায়চারি করে তখনও অন্যমনস্কভাবে। এবার ভাস্বতী চোখ মেলে চাইল। চোখ মুছল। তখন ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে।]

ভাস্বতী : তুমি ঘুমোও নি সুবিনয় ?
ছি-ছি, কী ঘুম পেয়েছিল আমার !

সুবিনয় : ও কি কথা।
তুমি ঘুমোতে পারলে, সে জন্য আমার কী প্রশান্তি ?
এখনও ভোর হয় নি,
সপ্তর্ষির চোখে এখনও নীরব প্রশ্ন
মৃত্তিকার পৃথিবীকে ঘিরে

পাখির চোখের মতো আকাশের আলো
ক্রমশঃ তরল হয়ে ধীরে ধীরে
মিশে যাবে সকালের রোদে।
তুমি এখনি জাগলে কেন, ভাস্বতী ?

ভাস্বতী : [উঠে দাঁড়িয়ে] আমার বুকে কী এক আশঙ্কা
সুবিনয়, বারবার তোলপাড় যেন এক সমুদ্র গর্জন
পাখিরা ডাকছে, আমি চমকে উঠছি
এক গভীর ঘুমের রাজ্যে গিয়ে
বারবার তারই ছায়া দেখি
মনে হয়, চেয়ে থাকি, এলো কি, এলো কি ?
এ ভার আমি আর সইতে পারি না সুবিনয়।

সুবিনয় : শান্ত হও তুমি ভাস্বতী
আমি তো রয়েছি তোমার পাশে
ওঠো
জল দিয়ে এসো চোখেমুখে
জড়তা কাটবে ঘুমের।

ভাস্বতী : তোমাকে কী দিলাম সুবিনয় ?
শুধু দুঃখ আর বেদনার ভাগ।
প্রাণের ছোঁয়াতে তুমি
উজ্জ্বল করলে ভাস্বতীর মন
তোমাকে কী দেবো ?

সুবিনয় : ও কথা বলো না তুমি, ভাস্বতী
তোমার হৃদয়কে জানলুম,
এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া।

ভাস্বতী : লজ্জা দিও না আমাকে।

সুবিনয় : শুধু মনে রেখো
কখনও যদি ক্লান্তির ভারে
বিষণ্ণ হয়ে ওঠে মন, সেদিন আমাকে
মনে করো। তাহলেই ধন্য হবো
আর চাই না কিছুই।

ভাস্বতী ঃ [সুবিনয়ের বুকে মাথা রেখে]
আর শুনতে চাই না সুবিনয়
যদিও তোমার কথায় কতো তৃপ্তি
কতো শান্তি।

[ভাস্বতীর চোখে জল। তাকাল সুবিনয়ের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে চলে গেল বাথরুমে। সুবিনয় পায়চারি করতে করতে বাইরে চলে গেল। মঞ্চে আর ওকে দেখা গেল না। ভোর হয়ে আসছে। পাখিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। একজন যুবক আর একটি লোকের সঙ্গে ওয়েটিং রুমে ঢুকলো। চোখে তার কালো চশমা। একটি চেয়ারে যুবকটি বসল।]

যুবক ঃ আমি বসছি, তুমি জেনে এসো
ট্রেনের কতো দেরী।

লোকটি ঃ আমি যাচ্ছি!

[লোকটি চলে গেল। খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। বাথরুম থেকে জলের শব্দ। ভাস্বতীর মুখ ধোয়া শেষ হল। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে ঢুকল সে।]

যুবক ঃ [ব্যস্ত হয়ে]
অরুণ, এলে
ট্রেনের খবর জানতে পারলে কিছু?
[ভাস্বতীকে দেখে]
কে? আপনি···মানে তুমি!

ভাস্বতী ঃ তুমি, কল্যাণ···

[ভাস্বতী দৌড়ে এসে কল্যাণের পায়ের কাছটিতে এসে ওর কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল]

যুবক ঃ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না
এখানে কী করে এলে তুমি?

ভাস্বতী ঃ এসেছি তোমার জন্য।
[এমন সময় সুবিনয় এসে ঢুকল]
সুবিনয়, আজ এক আশ্চর্য রাত, সুবিনয়

আজ তোমার সঙ্গে যেমন আকস্মিক পরিচয়
তেমনি এক আকস্মিকতায় পেয়েছি কল্যাণকে
এই তো কল্যাণ।

সুবিনয় : নমস্কার, আমি ভাস্বতীর বন্ধু
আপনার জন্য রাত্রিদিন যে জেগে আছে
আজ তাকে পেয়ে গেলেন,
আজকের রাত্রিটা সত্যই পরমাশ্চর্য।

কল্যাণ : আশ্চর্য হয়েছি আমিও,
তবে কেন এই নিষ্ফল প্রতীক্ষা!

ভাস্বতী : যদি ভুল হয়ে থাকে, ক্ষমা করো
ক্ষমা করো,
ভাস্বতী তোমার।

সুবিনয় : সম্পূর্ণ আপনার।

কল্যাণ : কেউ কারো সম্পূর্ণ নয় সুবিনয়বাবু,
আমরা যদিও তা ভাবতে চাই।

ভাস্বতী : আমি সম্পূর্ণ তোমার কল্যাণ,
ওতে ভুল নেই।

কল্যাণ : যে সময় চলে গেছে তাকে আর
কোনো মূল্য দিয়েই ফিরে পাওয়া যাবে না।

ভাস্বতী : তুমি নির্দয় হয়ো না কল্যাণ,
তোমার কাছে আজ কী মন নিয়ে এসেছি
তা জানে সুবিনয়,
তুমি ফিরায়ো না।

কল্যাণ : যে সময় চলে যায়
তাকে কে ফেরাবে?
তুমি তো জানো ভাস্বতী, তবু কেন
কান্না দিয়ে মনকে ভোলাও?
তার চেয়ে যে যেখানে আছি
বিরহের স্মৃতি নিয়ে যতদিন বাঁচি,
সেই ভালো।

অতীতের সেই সোনারঙা দিনগুলি
স্মৃতিতে মনকে দোলা দেবে।
প্রতিদিনের ছোঁয়ায় তাকে ম্লান করো না,
শুধু থাক, স্মৃতি জড়ানো বসন্তের দিন
তাকে প্রতিদিন মনের রঙ দিয়ে সুন্দরের
কোমল প্রলেপে ঢেকে রেখো,
আলো দিও ভালোবাসার প্রদীপে।
আর কিছু চেয়োনা, আমার কাছে।

ভাস্বতী : কল্যাণ, নিষ্ঠুর হয়োনা
স্মৃতি নিয়ে কেন বাঁচবো,
আকস্মিকতায় যদি এলে, তবে ফিরায়ো না।
আমার মনের আকুতি মানো,
গাছের শাখায় শাখায় ফুটবে নতুন ফুল
বসন্তের হাওয়া যেমন নাচের তালে তালে
গাছেরে দোলায় তেমনি ফোটাবো ফুল,
পাতা ঝরা শাখায় শাখায়,
তুমি ফিরায়ো না।

কল্যাণ : [অকস্মাৎ রূঢ়কণ্ঠে]
কেন ফেরাবো না ?
অনেক ছলনা জানো, মায়াবিনী নারী।
আমি জানি, সব জানি
ভুলেছো অনেক দিন কল্যাণের প্রেম
বাসি ফুলে মালা গেঁথে যদি বলো এই তো এলেম
আমাকে গ্রহণ করো, আমি সেই আমি
ভুলবো না সে কথায়
মনের গভীরে দেখো নেমে
যেন মুছে দেওয়া শ্লেট, কোনো চিহ্ন তার
আজ নেই, সব ভার ফেলে দিয়ে গেছো
এক যুগ আগে,
তাকে আর কী করে ফিরে পাবে ?

ভাস্বতী ঃ [অশ্রুরুদ্ধ গলায়]

নির্মম হয়োনা কল্যাণ,
আমি ভাস্বতী, তোমার ভাস্বতী
আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি না,
তুমি একদিন আমায় রক্ত গোলাপ
দিয়ে বলেছিলে, এই আমার হৃদয়ের রঙ ভাস্বতী,
আমি তাকে মাথায় করে রেখেছি
আর তুমি···

[অঝোরে কাঁদতে থাকে ভাস্বতী। কোনো কথা ওর মুখ থেকে বেরোয় না। সুবিনয় এতক্ষণ বিহ্বলের মতো তাকিয়েছিল। এবার সে সম্বিত ফিরে পেল।]

সুবিনয় ঃ মাপ করবেন কল্যাণ,
আপনাদের কথার মাঝখানে আমি আগন্তুক
আমি জানি তবু
তীর-খাওয়া হরিণীর মতো,
অনেক আঘাতে জর্জরিত ভাস্বতীর মন,
তাকে ডেকে নিন।

কল্যাণ ঃ তা হয় না।

সুবিনয় ঃ ভুল যদি করে থাকে, তাকে ক্ষমা দিয়ে
ঢেকে দিন, প্রেমের আলোকে তার জীবনকে
উদ্ভাসিত করে দিন
এত অকরুণ হবেন না।

কল্যাণ ঃ সময় তার কশাঘাত রেখে গেছে,
আমি অকরুণ নই।

সুবিনয় ঃ আমি যতটুকু জানি,
এই ক্ষণটুকুর জন্য ভাস্বতীর মন
কতকাল প্রতীক্ষা করেছে।
আপনি তাকে ফেরাবেন না,
তার কোনো দোষ নেই, অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত
তার হৃদয়
তাকে দিন শান্তির প্রলেপ

কল্যাণ ঃ [রুষ্ট হয়ে]

কেন এত আগ্রহ আপনার ?

ভাস্বতীর নতুন দোসর।

ভাস্বতী ঃ [অশ্রুভেরা গলায়]

নির্মম হয়োনা কল্যাণ,

সুবিনয় আমার বন্ধু, বেদনার সাথী।

কল্যাণ ঃ [ব্যঙ্গের সুরে]

সেটা আগে জানালেই পারতে।

ভাস্বতী ঃ অমন ভাবে বলো না,

তার হৃদয় অনেক বড়ো

তোমার আমার উভয়েরই স্থান আছে

তোমারও পরম বন্ধু

আমাকে যত আঘাত দাও, অপমান, লজ্জা

সব মাথা পেতে নেবো

সুবিনয় মমতা দিয়ে যদি রাতটুকু ভরে দিয়ে থাকে

তাকে অপমান করো না।

কল্যাণ ঃ কে কাকে করেছে অপমান ?

তুমিই ভেবে দেখো একবার,

তোমার অহংকারে আমার ভালবাসা

ধুলোয় লুটালো, তবু কোন মতে

আমি তার ধুলো ঝেড়ে নিয়ে গেছি

মনের গভীরে,

তুমি তাকাও নি ফিরে।

ভাস্বতী ঃ কল্যাণ !

কল্যাণ ঃ প্রায় এক যুগ,

কেটে গেছে এক যুগ।

বসন্তের মাতাল বাতাস ফিরে গেছে,

তুমি তো তখন ডাকলে না,

ভুল বুঝে চলে গেলে,

আমি দগ্ধ হয়ে ফিরে গেছি,

অশান্তির সে বোঝা বয়েছি
আজ আর কিছু নেই তোমার জন্য ভাস্বতী
আমার জীবন পাত্র শূন্য, সবই শূন্য।

ভাস্বতী : না, না, না,
আমি শুনবো না।
আমার চোখের দিকে দৃষ্টি দাও,
একবার ফিরে তাকাও
আমি, সেই আমি, কল্যাণ,
আঠারো বসন্তে তুমি যাকে জানতে
তারার আগুন ভরা রাতে
এই দুটি হাতে
নির্বাক প্রহরগুলি যতো স্পর্শ দিয়ে গেছে
আকাশ কি সব ভুলে গেছে ?
[কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে ভাস্বতী]

সংবিনয় : আমি আর সইতে পারছি না ভাস্বতী
তোমার চোখের জল,
তুমি কেঁদো না !
[কল্যাণের হাত ধরে]
জানি, আপনি আমার ভুল বুঝবেন
কিন্তু, আমি ভুল বুঝিনি।
ভাস্বতী আপনার,
আপনাকে পেয়ে ও সুখী হোক
ওর ভাঙা জীবন আবার জোড়া লাগুক
এই চেয়েছি আমি, আর কিছু নয়
যদি জানি ভাস্বতী পেয়েছে তার প্রার্থিত আশ্রয়
স্বপ্ন ও জাগরণে যাকে পাবার জন্য
হয়েছে অধীর, সে তাকে নিয়েছে বুকে
তাহলেই আমি চলে যাবো।
দাঁড়াবো না, প্রশ্ন করবো না
কিছুই চাইব না।

[স্টেশন মাস্টারের প্রবেশ]

স্টেশন মাস্টার : কী হচ্ছে মা আমার ?
ট্রেন তো এসে গেল ।

সুবিনয় : মাস্টার বাবু, এরই নাম কল্যাণ
আকস্মিক দেখা হয়ে গেছে ।

স্টেশন মাস্টার : আনন্দ করো সুবিনয়,
ভাস্বতীর জন্য সবাই আনন্দ করো ।

কল্যাণ : কীসের আনন্দ ? কার জন্য আনন্দ ?
যন্ত্রণায় দগ্ধ আমি
আর কেন যন্ত্রণার আগুনে পোড়াবেন ?
আর আমি অভিনয় করবো না ।
আমাকে আপনারা মুক্তি দিন,
আমি কারো জীবন আর ভরাতে পারবো না,
সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে গেছে ।
আমি রিক্ত, আমি ব্যর্থ
অন্ধকারে ঢেকেছে দুই চোখ

[করুণ কম্পন উঠবে সেতারে । কালো চশমা খুলে নেয় কল্যাণ । দেখা যায় ওর নিষ্প্রভ চোখ দুটি ।]

আমি প্রায় দৃষ্টিহীন
এ চোখের আলো ধীরে ধীরে মুছে যাবে
তারপর সব অন্ধকার
অন্ধকার
অন্ধকার

[একটা আর্ত চীৎকার ভাস্বতীর কণ্ঠে]

ভাস্বতী : এ কি দেখালে তুমি কল্যাণ ?

স্টেশন মাস্টার : অন্ধকার

সুবিনয় : আরও অন্ধকার
হে আকাশ, আলো দাও
আলো দাও ওই দুটো চোখে

তুমি তো কৃপণ নও,
পৃথিবীকে দিয়েছো তো রৌদ্র-মোড়া দিন
প্রতিদিন,
তবে কেন নিয়ে গেলে এ চোখের আলো ?
[কল্যাণের সঙ্গী লোকটির প্রবেশ]

লোকটি : ট্রেনের সময় হয়েছে,
চলুন আমরা এগোই ।

কল্যাণ : তুমি যাও, আসছি আমি
[বিছানাপত্র নিয়ে লোকটি চলে গেল]
আমাকে এখন যেতে হবে
আমাকে যেন কেউ পথ আটকে না দাঁড়ায়
আমি সব ভুলে যেতে চাই,
সব স্মৃতি, সব অঙ্গীকার
আমার সামনে বিস্তৃত অন্ধকার
এখন শুধু তার সঙ্গেই হবে সংলাপ ।
আর কারো কথা নয়
কতো রাত, কতো দিন প্রার্থনা করেছি
আলো দাও, আলো দাও হে বিধাতা
আলো দাও চোখে,
দস্যুর মতো প্রতিদিন
কেড়ে নিয়ে যায় আলো,
আমি অন্ধকার অতলে ডুবে যাই
আমি অন্ধ হয়ে যাবো,
অন্ধ অন্ধকারই আমার উপার্জিত
প্রেম নয়, অনুরাগ নয়, কোনো স্মৃতি নয় ।
শুধু এক নিষ্ঠুর বিনাশ ।

ভাস্বতী : না না, আমরা বাঁচবো
জীবনের মহত্তম অঙ্গীকারে আমি বাঁচবো
তোমার দেওয়া রক্ত গোলাপ এখনও অম্লান
তুমি ভুলে যেয়ো না ।

স্টেশন মাস্টার : আমি কী বলবো,
হা ঈশ্বর।

সুবিনয় : আপনি চলে যাবেন না কল্যাণ,
ভাস্বতীকে নিয়ে যান।

কল্যাণ : মাপ করবেন,
ক্ষমা করো ভাস্বতী
আমার আলোর দিনে যাকে পাইনি
অন্ধকারে তাকে কী দেবো ?
আমি একা, এই অন্ধকারে
আমি আজ একা।
তুমি ফিরে যাও, ভাস্বতী।

[সবাইকে হতচকিত করে দিয়ে কল্যাণ চলে যায়। স্টেশন মাস্টার কী যেন বলতে বলতে তার পেছনে যান। বিহ্বলের মতো তাকিয়ে থেকে ভাস্বতী 'সুবিনয়' বলে ডেকে তাঁর বুকের ওপর মাথা রেখে কেঁদে ওঠে।]

প ট ক্ষে প

বধ্যভূমিতে বাসর

গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী

বন্ধুবরেষু

চরিত্র লিপি

পরমেশ্বর	অনন্তরাম	জল্লাদ
গুপী	লাবণ্যময়ী	জনতা

বধ্যভূমিতে বাসর

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা উঠলেই দেখা যাবে এক স্তব্ধ জনতা ! ঘরফিরতি মানুষ সব। নর ও নারী। সারাদিনের কর্মক্লান্তির ছাপ রয়েছে চোখে মুখে। মঞ্চের এক কোণে জ্বলছে লাল আলো। সন্ধ্যার আকাশের অপসৃয়মান আলোকবিন্দু যেন। জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে একটি লোক কথা বলছে।]

পরমেশ্বর : কথা কও, কই হে বাপের সুপুত্রগণ, কই গো সতী রমণীর স্বামীরা
এবার মুখ খুলছে না কেন ?—সব চুপচাপ
কথা কও, এই স্তব্ধতা ভাঙো, চুরমার করো এই
দুঃসহ নৈঃশব্দ্য
এই তো এতক্ষণ বেশ ছিলে পোষা পাখির মতন
সরব, কলকণ্ঠ আনন্দে আত্মহারা
এখন সব চুপ কেন ? কথা কও
বাপের সুপুত্রগণ আর তোমারা, সতী রমণীর স্বামীরা।

[জনতার মধ্যে চাপা গুঞ্জন। এই তিরস্কার তাদের শুনতে ভাল লাগছে না। অথচ কোথায় যেন সত্য আছে কথাগুলো। জনতার থেকে একজন জবাব দিল]

গুপী : বেতাল কথা কইছো কেন পরমেশ্বর
তুমি কি আমাদের রক্ষক ? তুমি কি আমাদের অভিভাবক ?

[জনতার ভিতর থেকে সায় আসে : ঠিক ঠিক]

যদি তোমার কিছু বলার থাকে বলো ভালভাবে
অমন বাচালের মতো যা তা কথা কয়ো না
আমাদের বড় শোক,

বিশাল দুঃখ আমাদের পরমেশ্বর
আমাদের আর দাগা দিয়ো না হে,
আমাদের বাড়ি ফিরতে দাও, আমরা বড় ক্লান্ত।

পরমেশ্বর ঃ হা হা হা হা
এই হাসি জমা ছিল তোমাদের তরে শোনো গুপী
আমি তোমাদের রক্ষক হতে যাব কেন ?
প্রতিপালক হবার কোনো ইচ্ছাও নেই
তোমাদের অভিভাবক তোমাদের অন্নদাতা
এই মহাযন্ত্রশালার অধিপতি কর্মেশ্বর
তোমরা তো নিশ্চিন্ত।

অনন্তরাম ঃ তুমি পরিহাস করছো পরমেশ্বর
আমাদের নিশ্চিতি কোথায় ? সে কি তোমার অজানা ?
আমাদের শোকের দিনে তোমার এই বিকৃত পরিহাস
ছুরির ঘায়ের মতো বিঁধছে ;
কি নিষ্ঠুর তুমি পরমেশ্বর
তোমার রক্তে কি পিতৃপুরুষের কোনো ঋণ নেই
তুমি কি নির্মম আমাদের বিধাতার মতো ?

পরমেশ্বর ঃ তুমি ভুল করেছো অনন্তরাম, আমি নির্মম নই
আমি বিধাতাও নই···বিধাতা তোমাদের কর্মেশ্বর
এই শোকের ঘটনার চরম দায়িত্ব যাকে বইতে হবে।
তোমরা পোষা পাখির মতো দানা খেয়ে চুপ করে আছো
তাই দরকার ছিল এই চাবুকের।
তোমরা কিছু বলো, অনন্তরাম, গুপী
তোমরা কিছু বলো, এই মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য ভাঙো
আনন্দ কাল রাত্রে মারা গেছে।

['আনন্দ মারা গেছে' 'মারা গেছে' ইত্যাদি অস্ফুট শব্দ ক্রন্দনের মতো, বোবা প্রার্থনার মতো উঠতে থাকে জনতার মধ্য থেকে]

আমাকে তোমরা কাঁদতে দাও,
তোমরা কাঁদো সবাই।

[সেই অস্ফুট কান্নার ভেতর থেকে শোনা যায় এক নারী কণ্ঠ]

লাবণ্যময়ী : না আমরা কাঁদব না

[সকলে তাকায় সেই শোকস্তব্ধ রমণীর দিকে]

আর কান্না নয়
আমাদের চোখের জল সব শুকিয়ে গেছে
আমাদের কান্নায় আর আনন্দ ফিরবে না ।

['আর আনন্দ ফিরবে না' 'ফিরবে না' ইত্যাদি শব্দ ওঠে জনতার ভেতর থেকে]

আমরা যাকে ভালবাসতে চাই তাকেই আমরা হারাই
আমরা কখনো মা হতে পারি না
আমরা চিরকালের বন্ধ্যা
আমরা কখনো প্রেমিকা হতে পারি না
আমরা চিরকালের পতিতা ।
আমাদের কোনো প্রত্যাশা নেই, ভয়ও নেই
প্রেম নয়, আমরা চাই শুধু ঘৃণা
আরো ঘৃণা, শুদ্ধ পবিত্র ঘৃণা ।

[গুঞ্জন বাড়ে । রমণীরা চঞ্চল হয়, পুরুষেরা বিস্ময়ে দৃষ্টিপাত করে এই উজ্জ্বল রমণীর দিকে]

পরমেশ্বর : তুমি ?
তুমি এখানে কেন লাবণ্যময়ী ?
তুমি এখানে খুবই বেমানান
তুমি বহিরাগত ··আগন্তুক ।

লাবণ্যময়ী : বহিরাগত ? আগন্তুক ?
খুব কথা শিখেছো পরমেশ্বর
তোমার মতো বহু পুরুষ আমাকে বাঞ্ছা করে ফিরে যায় ।

[জনতা থেকে ছি-ছি শব্দ ওঠে । 'এসব কি কথা হচ্ছে' বলে কেউ কেউ]

ছি-ছি করার কিছুই নেই
আজ রাখঢাক করেও কিছু বলব না

যা সত্য, যা অনিবার্য তাই আজ বলতে হবে
আমি এই কর্মনগরীর বহু বাঞ্ছিতা এক নারী…পতিতা
আমি পাপের ভিতরে আছি, তাই পুণ্যকে এড়িয়ে চলি
তোমাদের এই পরমেশ্বরের মতো আড়ম্বরে বিশ্বাস করি না
আমি তৃষ্ণার্তকে দিই শান্তি, ক্ষুধার্তকে দিই পরিতৃপ্তি.
এর কোনো বিকল্প নেই
আমরাই অনাদিকালের আশ্রয়
তৃষ্ণার্তের ক্ষুধার্তের আমরাই অনাদি নারী।

গুপী : এসব হেঁয়ালী আমরা বুঝি না গো নারী
আমাদের ঘর সংসার আছে…আমরা পতিতালয়ে যাইনা।

অনন্তরাম : নিশ্চয় নিশ্চয়
আমরা কোনোদিন তোমাকে বাঞ্ছা করিনি।
আমরা ঘর আর কারখানা, কারখানা আর ঘর
এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ চিনি না।

লাবণ্যময়ী : এবার চিনতে হবে গুপী, অনন্তরাম।

গুপী ও অনন্তরাম : আমাদের নাম জানল কী করে
বড়ই আশ্চর্য!

লাবণ্যময়ী : আশ্চর্যের কিছু নয়
আমাদের সব জানতে হয়।

পরমেশ্বর : কেন এখানে এসেছ লাবণ্যময়ী?
তুমি কি জানো না এদের মনের মহাশোক
গভীর বিষাদে লিপ্ত ইহাদের ক্ষণিক জীবন?

লাবণ্যময়ী : ওই আকাশের জ্বলন্ত নক্ষত্রের দিকে একবার তাকাও
সহস্রযুগের শোকাগ্নি বুকে করে জ্বলছে অনন্তকাল
ওই দ্যাখো, কত কালের মানুষ ওর দিকে তাকিয়ে চলেছে
পশ্চিম দিগন্ত হতে পূবের দিকে
রাত্রির অন্ধকার অঞ্জলির পর সকালের আলোকের দিকে।
দ্যাখো, দ্যাখো

[কই কই দেখি দেখি—বলে সব লোক, স্ত্রী পুরুষ
জনতা সব আকাশের দিকে তাকায় একমাত্র পরমেশ্বর

ছাড়া। সে তাকিয়ে আছে লাবণ্যময়ীর দিকে অপলক দৃষ্টিতে]

লাবণ্যময়ী : কী দেখছো পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : আমি তোমার চোখ দুটো দেখছি লাবণ্যময়ী।

লাবণ্যময়ী : আমি তোমার সখি নই পরমেশ্বর
ওভাবে কথা বলো না তুমি

পরমেশ্বর : [প্রচণ্ড হাস্য করে]
হা হা হা হা শোনো শোনো শোনো তোমরা
লাবণ্যময়ী বলছেন—
[কী বলছেন ? কী বলছেন ? ইত্যাদি শব্দ জনতা থেকে]
বলছেন লাবণ্যময়ী : আমি তোমার সখি নই পরমেশ্বর
ওভাবে কথা বলো না তুমি
হা হা হা হা
[একটু থেমে]
আমি বলি, তুমি তবে কার সখি লাবণ্যময়ী ?
তুমি কীসের জন্য এসেছো এখানে
মানুষের সর্বনাশা শোকের মাঝখানে ?

লাবণ্যময়ী : তুমি আমাকে অপমান করছো পরমেশ্বর

অনন্তরাম : যথার্থ বলেছো তুমি নারী,
পরমেশ্বর আমাদের বিদ্রূপে জর্জরিত করছে
আমাদের হৃদয়ে মহাশোক।

গন্ধপী : আমরা কতদিন ভোরের আলো দেখিনি।

অনন্তরাম : আমরা কতদিন নদীতে যাইনি।

সমবেতকণ্ঠে : আমরা এখানে বন্দীর জীবনযাপন করছি
আমরা বেরোবার পথ জানিনে।

পরমেশ্বর : তোমরা সব নির্বোধ, নিরেট, বোকা
তোমাদের মাথায় কি সার পদার্থ আছে ?

সমবেতকণ্ঠে : কেন ? কেন ? কেন ?
তুমি কি নিজেকে সবার চেয়ে বুদ্ধিমান মনে করো ?

লাবণ্যময়ী ঃ তুমি কি সবাইকে উপহাসের পাত্র মনে করো ?

[পরমেশ্বর সকলের দিকে একবার তাকায়। তার চোখে মুখে এবার যেন বিষাদের ছায়া নামে।]

পরমেশ্বর ঃ তোমরা ভুল করছো
আমি নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করিনে,
উপহাসও আমার অস্ত্র নয়
আমি তোমাদের এই আচ্ছন্ন বিষাদ থেকে মুক্ত করতে চাই
আমরা মুক্তি চাই।

সমবেতকণ্ঠে ঃ আমরা সকলেই মুক্তি চাই।

লাবণ্যময়ী ঃ কীসের সে মহাশোক ?
আনন্দের মৃত্যু ? কোন নক্ষত্রের আলোয়
উদ্ভাসিত সে মহামৌন বিপন্ন বিষাদ ?

পরমেশ্বর ঃ আমাদের সমগ্র অস্তিত্ব, আমাদের বিবেক লাবণ্যময়ী
আমাদের বিক্রীত বিবেক।

সমবেতকণ্ঠে ঃ আমরা শয়তানের কাছে বন্ধক দিয়েছি আত্মা
আমরা নিজেকে নিজেরা চিনতে পারি না।

[দূরে কারখানার বাঁশি বাজে···মোটরের হর্ণ, টাকার শব্দ ইত্যাদি প্রতীকী ব্যবহার]

ওই ওই শয়তানের কণ্ঠস্বর, শিস দেয় ভৌতিক ইঙ্গিতে
নিশির ডাকের মতো, এইবার অন্যসব নরনারী
যে যেখানে আছে চলে যাবে শয়তানের কাছে

পরমেশ্বর ঃ এ যন্ত্রশালায় মানুষ মারার যন্ত্র তৈরী হয় লাবণ্যময়ী
যেখানে যত সংঘর্ষ, রক্তপাত
সর্বত্র এই অস্ত্রের যাতায়াত

অনন্তরাম ঃ ভীষণ রক্তপাত, চতুর্দিকে অজস্র রক্তের বন্যা
অশ্রুপাত
মানুষের হাতে রক্ত···মানুষের হৃদয়ের কাছে
মানুষের কোনো মূল্য নেই।

গুপী ঃ আমরা নরকে আছি শয়তানের ক্রীতদাস হয়ে
আমাদের মুক্তি নেই।

পরমেশ্বর ঃ লাবণ্যময়ী, তুমি এদের দিকে তাকাও
সকলেরই এক মুখ, এক বেশ,
আত্মাহীন পুতুলের মতো, স্বয়ংক্রিয় রোবোট যেন
কথা বলে, মাথা নাড়ে, হাসিকান্না সব কিছু আছে
শুধু নাই মানুষের স্বাধীন বিবেক আর স্বাধীন চিন্তা।

লাবণ্যময়ী ঃ আকাশের দিকে তাকাও গুপী, অনন্তরাম,
তাকাও পরমেশ্বর
নক্ষত্রের অনন্তবীথি পড়ে আছে মুক্তোর মালার মতো
দীপ্ত চোখ তারকার, দেখে মনে হয় যেন চেয়ে আছে
আমাদেরই দিকে,
আমাদের লক্ষ্য ওইখানে, আমাদের আশা
মানুষ চিরকালের স্বাধীন, তার কোনো বন্ধন নেই।
মুক্তিই অন্বিষ্ট তার

পরমেশ্বর ঃ তুমি আকাশের দিকে কী দেখাচ্ছো লাবণ্যময়ী
স্বপ্নের ফানুস ?
তার কোনো শিকড় পাবে না খুঁজে
আমাদের শিকড় মাটিতে, তাকে তুমি আলগা করো না।

[দূরে ঘণ্টা বাজতে থাকে, মানুষগুলো নিষ্প্রভ চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়। যাবার জন্য উসখুস করে]

অনন্তরাম ঃ আমরা তাহলে যাই পরমেশ্বর
আমাদের যাবার ঘণ্টা বাজতে সুরু করেছে।

গুপী ঃ আমরা যেন সেই হামেলিনের ইঁদুরের মতো
বাঁশির শব্দ শুনলেই পিছন পিছন ছুটি।

কোনো তৃতীয় কণ্ঠ ঃ যেন এক অন্ধ নিয়তি
বেঁচে থাকাটাই আমাদের দণ্ড
বেঁচে থাকার কী অসহনীয় ক্লেশ
মৃত্যুই আমাদের মুক্তি লাবণ্যময়ী।

পরমেশ্বর ঃ চুপ করো হতভাগার দল
দার্শনিকের মতো কথা বলতে শিখেছো

[হঠাৎ গায়ের জামা খুলে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। সবাই আঁৎকে শব্দ করে ওঠে। একটা গভীর ক্ষতের দাগ]

মনে আছে তোমাদের গ্নপী ? মনে আছে অনন্তরাম ?
তোমাদের বাঁচাতে গিয়ে একদিন মিলেছিল
এই চাবুকের ঘা।

সমবেতকণ্ঠেঃ মনে আছে পরমেশ্বর,
সেই শয়তানকে আমরা এবার টুকরো টুকরো করবো
তুমি শুধু বলে দাও, কে সেই শয়তান ?

পরমেশ্বরঃ যে আমাদের বিবেকের ওপর প্রভুত্ব করছে
সেই শয়তান।

লাবণ্যময়ীঃ তুমি অমন বক্তৃতার ভাষায় কথা বলোনা পরমেশ্বর
এ দংশন শুধু তোমার নয়
আমাদের সময় অস্তিত্ব এর দ্বারা কলুষিত
তোমাদের গেছে বিবেক, আমাদের যাচ্ছে দেহ।

[কে যেন 'ধিক ধিক' করে উঠল]

তোমাদের লজ্জা করা উচিত
বিবেক বিক্রয় করলে হয় শোক
দেহ বিক্রয় করলে বলো, ধিক ধিক।

পরমেশ্বরঃ উভয়েই শোকের বিষয়
আমরা শোকাহত লাবণ্যময়ী
এসো আমরা সেই শোকের উৎসের দিকে যাই।

গ্নপীঃ উৎসে যেতে হলে আমাদের নীরব হতে হবে
আমাদের মুখরতা সেই শোকের নিদ্রা ভেঙে দেবে পরমেশ্বর।

অনন্তরামঃ চুপ কর তুই গ্নপী
তুইও দার্শনিক হয়ে উঠলি।

লাবণ্যময়ীঃ তোমরা ঝগড়া করো না গ্নপী, অনন্তরাম
পরমেশ্বর আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে।

[সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। মানুষগুলিকে সেই অদ্ভুত আঁধারে বিস্ময়কর মনে হয়। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ। ধীরে ধীরে প্রলম্বিত হয় এক ছায়া। প্রবল

অট্টহাস্যে স্তব্ধতা খান খান করে এক রহস্যময় মূর্তির আবির্ভাব। চেহারা ভীতিপ্রদ, সে নিষ্ঠুর জল্লাদ]

সকলে : ওই ওই সেই শয়তান,
পরমেশ্বর, তুমি আমাদের রক্ষা করো
লাবণ্যময়ী তুমি সরে এসো শয়তানের কাছ থেকে।

জল্লাদ : আমি শয়তান নই মূর্খ নির্বোধের দল
আমি জল্লাদ
হত্যা করা আমার পেশা
আমি দোষগুণ বিচার করি না
আমি হুকুমের দাস।

সকলে : কে তোমাকে চালনা করে ?

জল্লাদ : জানি না···আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি।

সকলে : তুমি তার হুকুম মানো কেন ?

জল্লাদ : আমি তার ক্রীতদাস।

সকলে : ক্রীতদাস ? আমাদেরই মতো।

জল্লাদ : না, তোমাদের মতো নয়।
তোমরা নিহত হও, আমি নিহত করি
মরা ও মারার মধ্যে যে তফাৎ
তোমাদের আর আমার মধ্যে সেই ব্যবধান
হা হা হা হা।

লাবণ্যময়ী : হাসি থামাও, বলবান মূর্খ।

জল্লাদ : কে ? কে বললে ওই কথা ?
কার এত আস্পর্দ্ধা ?
কেউ যেতে পারবে না।
আজ তোমাদের সকলকে নিয়ে যাব।

সকলে : কোথায় ? কোথায় নিয়ে যাবে।

জল্লাদ : যেখানে সবাই যায়—বধ্যভূমিতে।

[জনতা থেকে আর্তনাদের শব্দ। আলো নিবে যায়। জল্লাদ মুখে অদ্ভুত শব্দ করে। সেই অন্ধকার, ব্রস্ততায়, কী ঘটছে কিছুই বোঝা যায় না।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অন্ধকার মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হলে দেখা যায় সেই জায়গাটিই একটি কারাগারের চেহারা নিয়েছে। উ'চুতে একটি জানালা। সামান্য একটু আকাশ দেখা যায় এই পর্যন্ত। একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আলো পরিষ্কার হতে থাকলে পরিচিত মুখগুলি ভাসতে থাকে···শুধু পরমেশ্বর আর লাবণ্যময়ীকে ছাড়া]

কণ্ঠস্বর : এইখানে তোমাদের নিয়তি, অন্ধকার নিয়তি
মৃত্যুর মতো নিশ্চিত, দয়াহীন দণ্ডের মতো অনিবার্য
তোমাদের বিক্ষোভ শুধু নিষ্ফল হাহাকার
তোমরা শুধু কাঁদতে জানো,
প্রতিবাদের অন্য ভাষা তোমাদের জানা নেই
এইখানে তোমাদের নিয়তি
এইখানে নিষ্করুণ বধ্যভূমি।

[চাপা গুঞ্জন ওঠে। মানুষগুলো ভয়ার্ত জন্তুর মতো বোবা চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়। কিছু যেন ঠাহর করতে পারে না। গুঞ্জন ক্রমশ উ'চু গ্রামে ওঠে]

কণ্ঠস্বর : তোমরা এই বধ্যভূমির শিকার
তোমাদের ব্যবহারে কোনো জীবনের প্রতীতি নেই
তোমরা আকাশের রঙফেরা দেখতে পাও না
তোমরা চিরকালের অন্ধকারে আত্মসমর্পিত
এইখানেই তোমাদের অন্ধকার নিয়তি।

[বলতে বলতে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায় একই কথা উচ্চারণ করতে করতে। জানালার ওপর আলো পড়ে। একটা পলাশ বা শিমুলের রক্তসজ্জায় দিগন্ত যেন উজ্জ্বল।]

গুপী : ওই দেখ দেখ, দিগন্তে আগুন জ্বলছে
এখন বোধ হয় ফাল্গুনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে অনন্তরাম
দেখ দেখ।

অনন্তরাম ঃ আমাকে আর ওই নামে ডেকো না গুপী
আমি আর ওই মানুষ নই
আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি।

গুপী ঃ কী যা তা বলছো অনন্তরাম,
দেখ দেখ দিগন্তে আগুন জ্বলছে
হাওয়া বইতে শুরু করেছে ফাল্গুনের
তার মানে···তার মানে
এই সময় রুকমিনী নদীতে জল আনতে যাবে
রুকমিনী-রুকমিনী আমি আসছি।

[দরজার দিকে এগিয়ে ঝম ঝম করে আছাড় খেয়ে পড়ে]

অনন্তরাম ঃ আমাদের কোনো দিগন্ত নেই···
আমরা খুঁজি না কোনো ফাল্গুনের ফেরারী বাতাস
আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ে চলেছে অন্ধ নিয়তি
বধ্যভূমির দিকে
তুমি কোথায় হে নিশ্চিত জল্লাদ,
তোমার শাণিত কথাগুলো আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করে দেয়

গুপী ঃ তোমার ওই অন্ধকারের জামাটা দেখলে
আমার সেই রাত্রির কথা মনে পড়ে জল্লাদ
যে-রাত্রিতে পথ হারিয়ে চলে এসেছিলাম এখানে
রুকমিনী তখনও ঘুমোচ্ছিল
ওর চোখে মুখে ছিল গভীর প্রশান্তি, আশ্রয়ের নিশ্চিত সান্ত্বনা
ক্লান্ত পাখির মতো গাছের শাখায়
সেই রাত্রি আমাকে যেন নিশির ডাকের মতো টেনে নিয়ে এল
এইখানে···আত্মবিক্রয়ের ফাঁদে।

[একটা কান্নার মতো শব্দ ওঠে। আবার যেন মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে শুধু জানালার ভিতর দিয়ে আগুন-রঙা আকাশ আর শিমুলের পলাশের ডাল দেখা যায়]

কণ্ঠস্বর ঃ এইখানেই তোমাদের অন্ধকার নিয়তি

এবং আমারও
তোমরা নিহত হও, আমি নিহত করি
হা হা হা হা
ভয় পাচ্ছো নাকি তোমরা, ক্লান্ত মানুষের দল ?

সকলে : হ্যা গো। আমাদের বড় ভয়
আমরা শয়তানের কাছে বিক্রয় করেছি বিবেক
আমরা নিজেরাই তৈরী করেছি নিজেদের মারণাস্ত্র
তাই দেখিয়ে তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো জল্লাদ

কণ্ঠস্বর : হা হা হা হা
আমি জল্লাদ নই, জল্লাদের অনুচর
আমি তার অস্ত্র বহন করি, তাতে শাণ দিই
আমিও পরাধীন তোমাদের মতো
আমিও আত্মবিক্রয় করেছি শয়তানের কাছে
আমি তাই শয়তানের চেয়েও শয়তান।

গুপী : তুমি দলত্যাগ করে আমাদের দিকে চলে এসো
তোমার হাতে আছে অস্ত্র
এসো সে অস্ত্র নিয়ে এই বন্দীশালা খান খান করি

অনন্তরাম : বৃহত্তর বন্দীশালায় প্রবেশ করার জন্য ?
ও কথা চিন্তাও করো না গুপী
তার চেয়ে এখান থেকেই শেষবারের মতো
দিগন্তকে দেখি।

কণ্ঠস্বর : বেশ দার্শনিকের মতো কথা বলছো তুমি
আমাদের প্রভু কী বলেন জানো ?
তিনি বলেন, দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে মানুষকে
প্রতারণার জন্য
তোমরা জানো না কীভাবে প্রতারিত হচ্ছো তোমরা।
তোমাদের জন্য করুণা হয়।

[খানিকক্ষণ স্তব্ধতা। দূর থেকে করুণ সুরে বাঁশীর আওয়াজ আসছে। ঝন্‌ঝন্‌ করে দরজা খোলার শব্দ হয়। দরজা খুললে গভীরতর অলিন্দ চোখে

পড়ে যেখান দিয়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় আসছে পরমেশ্বর। তার পাশে শোকমূর্তি'র মতো লাবণ্যময়ী।]

সকলে : ওই ওই আমাদের সঙ্গী পরমেশ্বর
ওই আমাদের প্রিয় সখি লাবণ্যময়ী

গুপী : পরমেশ্বর তোমাকে সেদিন কটুকথা বলেছিলাম
তুমি আমাদের মার্জনা করো
আমরা এখানে শবের মতো কাফনে ঢাকা পড়ে আছি
তুমি আমাদের উদ্ধার করো পরমেশ্বর·

অনন্তরাম : লাবণ্যময়ী তোমাকে সবটুকু জানি না
শুধু জানি তোমার হৃদয়ে অনেক ভালবাসা
তার রঙ ওই পলাশের মতো দিগন্ত উজ্জ্বল করা
তোমার ভালবাসার অবিরল নির্ঝরে আমাদের ধুইয়ে দাও
আমরা বড় তৃষ্ণার্ত।

জল্লাদ : [জল্লাদের প্রবেশ। পরমেশ্বর ও লাবণ্যময়ীর দিকে তাকিয়ে]
তোমরা আজ রাত্রি এখানেই অপেক্ষা করবে
তোমাদের অপরাধ গুরুতর
কর্মেশ্বরের এই যন্ত্রশালায় অসন্তোষ ক্ষেপিয়ে তুলেছো
এই বোবা মানুষগুলির মুখে দিয়েছো কথা
আমাদের স্তব্ধতার রাজ্যে এনেছো মুখরতা
কর্মেশ্বর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারেন না
তোমরা শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও
তোমরা বিদ্রোহী।

সকলে : ওহ্ ওহ্
কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতা।

জল্লাদ : [তলোয়ারে শান দিয়ে]
মসৃণ, অতীব সুমসৃণ, তৃষিত হয়ে আছে কতদিন
আমি ভুল করিনি কিছুই···
এ কর্মেশ্বরের আদেশ
তোমাদের জ্বালায় কতদিন তিনি ঘুমুতে পারেন নি।

তোমরা শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হও।

[সর্বত্র একটা চাপা গুঞ্জন। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। শিকলের শব্দ হয়। শুধু স্থির নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পরমেশ্বর]

লাবণ্যময়ী ঃ ও তরবারি কোন কাজেই লাগবে না।
হাজার মানুষের শিকল যদি এক সঙ্গে ঝন্‌ঝন্‌ করে ওঠে
তোমার তরবারি তাকে ঠেকাতে পারবে না।

জল্লাদ ঃ কে গো তুমি ? বিদ্রোহের সুরে কথা কও
দেখি দেখি

[কাছে গিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করে]

কে গো তুমি ? গলায় জুঁইফুলের মালা
কপালে কুমকুমের টীপ···মুখখানা তো বেশ
কারো নাগরী ছিলে বুঝি তুমি ?

গুপী ঃ চুপ করো নিষ্ঠুর জল্লাদ
ও আমাদের লাবণ্যময়ী
আমাদের সখী এবং মাতা যাই বলো তুমি।

জল্লাদ ঃ সখী এবং মাতা ! হা হা হা
এও কখনো হয় বেজন্মার দল ?
শুধু সখি বলতে বাধে কেন ? তার সঙ্গে অনুসর্গ মাতা !
থুঃ থুঃ থুঃ
তোমরা আমাকেও ঘেন্না ধরালে হতভাগার দল

[দরাম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যায়। জনতার মধ্যে থেকে শোনা যায় বিদ্রূপের ধ্বনি]

লাবণ্যময়ী ঃ পরমেশ্বর

পরমেশ্বর ঃ কী লাবণ্যময়ী ? আমাকে আবার ডাকছো কেন ?

লাবণ্যময়ী ঃ একবার দেখো ওরা সব তোমার জন্য
অপেক্ষা করে আছে। এরা তোমার অনুগত
গুপী, অনন্তরাম ও অন্যান্য সবাই
হাতে ওদের শিকল তোমার মতোই
ওরা আজ অসহায়,

ওদের দিকে তাকাও

গুপী : পরমেশ্বর, আমরা সব যূথবদ্ধ হয়ে
নিহত হবার জন্য সর্বনাশের প্রতীক্ষা করছি।
এই বধ্যভূমি থেকে বেরোবার পথ দেখাও তুমি
তুমি আমাদের বন্ধু, আমাদের সহযাত্রী।

অনন্তরাম : আমরা শিকল ভাঙতে পারি পরমেশ্বর,
সে বিদ্যা আমাদের জানা
কিন্তু এই বিরাট কারাগারের দরজা
ভাঙবো কি করে জানি না।

গুপী : বাইরে ফাল্গুনের মদির বাতাস বইছে।
আমার মনে পড়ছে রুক্মিণীর কথা।
রুক্মিণীকে ভুলিয়ে আমি চলে এসেছিলাম এখানে
কর্মেশ্বরের শয়তানী যন্ত্রশালায়
দুমুঠো অন্নের আশায় ··
আমার রুক্মিণী···।

পরমেশ্বর : আমি তোমাদের ঘুম থেকে ডেকে তুলতে এসেছিলাম
কিন্তু আমাকে বন্দী করেছে কর্মেশ্বরের অনুচর।
তোমাদের আর আমার একই দশা
আমার পিঠে চাবুকের দাগ, হাতে শিকল
লাবণ্যময়ী জানে,এ শিকলে নূপুরের শিঞ্জন ওঠে না পদে পদে
অন্ধকারের হিংস্রতা জ্বলে ওঠে ঘর্ষণে ঘর্ষণে,
আমরা সে আগুনে জ্বলতে থাকি,
আমি, তুমি, সে,···সবাই
বাইরে পলাশের ডালে আগুন, ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে দিগন্তরে
বনে বনে কৃষ্ণচুড়া শাখায় শাখায়
আমাদের অস্তিত্বে আগুন
তোমরা একবার জ্বলে ওঠো
জ্বলে ওঠো গুপী অনন্তরাম
এতদিন চুপ করে সয়েছো নির্যাতন
আজ তার ফল ভোগ করতেই হবে।

লাবণ্যময়ী : ওরা অসহায়, কিন্তু মূঢ় নয়
ওদের তুমি বিদ্রূপ করো না পরমেশ্বর।
এই অন্ধকারে ওদের কেটেছে দীর্ঘদিন
তবু ওরা মনে রেখেছে আলোকের কথা, আকাশের কথা।

গুপী : আমরা কিছুই ভুলিনি লাবণ্যময়ী
তুমি তো জানো,
আমাদের হৃদয়ে ছিল মহাশোক।

অনন্তরাম : আমরা কান্না দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি শোক
পরমেশ্বর, তুমি একদিন কাঁদতে চেয়েছিলে
আজ আমাদের তিরস্কার করছো কেন ?
তুমি আমাদের জন্য কিছু করতে না পারো তো
অশ্রু বিসর্জন করো।

গুপী : নইলে আমাদের কান্নায় এই অন্ধ কারাগার প্লাবিত হবে।
আমরা শুধু হুকুম তামিল করতে শিখেছি, পরমেশ্বর
নিজেদের চিন্তা কোনোদিন কাজে লাগাইনি।
পরমেশ্বর—

পরমেশ্বর : কী বলছো ?

গুপী : তুমি কিছু বলো পরমেশ্বর
আমাদের তুমি মুখর হতে বলেছিলে
এখন তোমার নীরবতা আমাদের হৃদয় দংশন করছে।

লাবণ্যময়ী : শান্ত হও গুপী, স্থির হও তুমি অনন্তরাম
একই ভবিতব্য দিয়ে বাঁধা এই সমাবেশ।
প্রহরী জল্লাদ ডেকে গেল অন্ধ নিয়তির মত
কিন্তু আমরা মানি না নিয়তির নির্মম বিলাপ।

সকলে : মানি না, মানি না, মানি না।

লাবণ্যময়ী : আমরা কর্মেশ্বরের মুখোমুখি হতে চাই।

পরমেশ্বর : কোথায় কর্মেশ্বর ?
ভীরু কাপুরুষ দণ্ড দিয়ে চালায় শাসন
সে কোথায় ? তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

[দূর থেকে একটা গানের সুর ভেসে আসে। সবাই

উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। সুর নিকটতর হয়। বোঝা যায় কারা যেন সমস্বরে কতকগুলি কথা বলছে সুর করে—]

নেপথ্য কণ্ঠ : আমরা সবাই বুঝি এবার হব পলাতক
যা হ'ক তা হ'ক
আমরা এবার সবাই পলাতক।
আমাদের ছিল না কানাকড়ি
এখন মিলছে গলায় দড়ি
প্রভু দিলেন সুড়সুড়ি
জীবনটাকে উড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতে দিই তুড়ি
আমাদের ছিল না কানাকড়ি।
আমরা সবাই বুঝি এবার হব পলাতক···
আহা গো, আহা, আহা, আহা !
যা বলি শোনো তাহা
চুপ করে থেকো না আর
তাহলে থাকবে নাক ঘাড়
একথা সত্যি সত্যি সত্যি বলছি যাহা
আহা গো, আহা, আহা, আহা।
চৈত্র মাসে এসেছিল সে কি ভীষণ ঝড়
ভেঙেছিল এই গরাদ ঘর
প্রভু হলেন খাপ্পা রেগে
সবাই ঘুম থেকে উঠল জেগে
বলল আজকে যা হ'ক তা হ'ক
আমরা এবার সবাই মিলে হব পলাতক।

[সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সুর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়]

গুপী : ওরা কারা ?

সকলে : ওরা কারা ? ওরা কারা ?

অনন্তরাম : ওরা কারা পরমেশ্বর
আমাদের হৃদয়ে বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল ?

গুপী : ওরা কারা লাবণ্যময়ী

ভবিতব্যের মতো কথা বলে গেল ?

লাবণ্যময়ী : ওরাও এখানকারই বন্দী মানুষ

সকলে : বন্দী ? আমাদেরই মতো বন্দী ?

লাবণ্যময়ী : বন্দী, তবে নির্ভয়।

পরমেশ্বর : ওরা বন্দী কিন্তু ওদের বিবেক মরেনি লাবণ্যময়ী
ওরা গাইছে শিকল ভাঙার গান
বুঝতে পারছো না ওদের কথা ?

লাবণ্যময়ী : বাইরের দিকে তাকালে চোখে পড়ে আগুন-রাঙা আকাশ
দূর থেকে ভেসে আসে জীবন্ত মানুষের গলার ডাক
মানুষের আগুনে-কণ্ঠস্বর।
তোমরা বুঝতে পারছো না, এসবই মুক্তির সংকেত,
ভাঙো ভাঙো এ শিকল,
বুঝতে পারছো না তোমরা গুপী, অনন্তরাম ?

গুপী : আমরা যেন আজ বধির হয়ে গেছি
শত বজ্রের আওয়াজ না হলে কিছু শুনি না।

অনন্তরাম : আমরা শেষবারের মতো মুক্তির কথা শুনবো
মুক্তি !···সে কি আকাশের পাখির ডানার মতো ?
মুক্তি !···সে কি নারীর ভালবাসার মতো

[দূরে মিছিলের শব্দ। নানাবিধ শ্লোগান আস্তে আস্তে তা মিলিয়ে যায়]

গুপী : ওইখানে আমাদের মুক্তি, অনন্তরাম
ওই মিছিলের তালে তালে আমাদেররই পদধ্বনি
আমি ওদের কণ্ঠস্বর চিনি
মানিক, বাবুলাল, নয়ন, ওরা সব
একদিন আমিও ওদের দলে ছিলাম
জানিনা কেমন করে চলে এসেছিলাম এইখানে
কর্মেশ্বরের গোলামখানায় ?

অনন্তরাম : আমি যেন নিজের নাম মনে করতে পারছি না
গুপী, তুমিই আমাকে এনেছিলে এখানে।
এখানে যেদিন এসেছিলাম

তখন আকাশে ছিল আজকের মতোই এক পাণ্ডুর চাঁদ
মনে হয়েছিল এই তো আকাশ, এই তো চাঁদ
আমাদের চিরকালের চেনা
মনে হয়েছিল, কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা এই চিরচেনাদের।

গুপী : [নির্লজ্জ হেসে]
তারপর ?···থামলে কেন অনন্তরাম ?
কাঁচা পয়সার লোভে যেদিন এসেছিলে
তখন তো পিছন ফিরে তাকাও নি ?
তখন গুপীর কত খাতির !
মনে আছে ? বলেছিলে, 'গুপী, আমাকেও নিয়ে চলো
কর্মেশ্বরের যন্ত্রশালায়,
সেখানে গেলে খেতে পাব

অনন্তরাম : মনে আছে, সবই মনে আছে।
আমাদের ঘরে ভাত ছিল না গুপী
ঘরণীকে দিতে পারতুম না দুমুঠো খাবার
শিশুদের কান্নায় আকাশ জমাট হয়ে উঠত
আমরা বড় দুঃখী ছিলাম।

গুপী : আর এখন ? সুখের ঢেউ ভাঙছে দেহে মনে
তাই না ?

লাবণ্যময়ী : তোমরা চুপ করো গুপী, অনন্তরাম
এ-তর্কের কোনো শেষ নেই জানি।
তোমাদের কোনো দোষ নেই। এই প্রলোভন সর্বত্র···
ক্ষুধার্ত ইঁদুর যেমন খাবারের খোঁজে গিয়ে
বন্দী হয় যাঁতাকলে, তোমরা এবং আমরা
সেই অমোঘ ভবিতব্যের হাতে বন্দী।

সকলে : অমোঘ ভবিতব্য ?

লাবণ্যময়ী : [আবিষ্টের মতো] তা নয়তো কি ? দুর্বার তার আকর্ষণ
মৃত্যুর দিকে, বিস্মরণের দিকে, নামহীনতার শীতল গলিতে
কী নিদারুণ আত্মসমর্পণ ?

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী

লাবণ্যময়ী : কিছু বলবে পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : আশ্চর্য গভীর কথা বলো তুমি,
তোমাকে নতুন করে দেখছি এই দুঃসময়ে,
গভীর বিপদের মাঝখানে,
তুমি সুন্দর লাবণ্যময়ী !

লাবণ্যময়ী : তুমি মোহমদির দৃষ্টিতে তাকিওনা পরমেশ্বর
ক্যাকটাসে কখন ফুল ফোটে ?
সে যে আকস্মিক আলোর ঝলকানি
জানতুম আমরাই বুঝি জন্ম রোমান্টিক
তুমি তো চিরকাল তাকে ব্যঙ্গ করেছো
বলতে, ও চাঁদ তোমাদের জন্য তোলা থাক লাবণ্যময়ী
কুকুর-কাঁদানো জ্যোৎস্নায় আমি বিচলিত হই না ।

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী !

লাবণ্যময়ী : ভুল বললাম পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : নিজেকে আমি বহুবার দীর্ণ করেছি
আত্মবিশ্লেষণের চাপে
এ যেন দর্পণে মুখ দেখা ।
তবু বলি, ব্যঙ্গ করতুম নিজেকেই, তোমাকে নয় ।

লাবণ্যময়ী : ও কথা এখন থাক
আমরা কর্মেশ্বরের মুখোমুখি হব আজ ।

পরমেশ্বর : কর্মেশ্বরের জাল পাতা আছে সর্বত্র
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে,
লাবণ্যময়ী তুমি তো স্বাধীন ছিলে
তুমি এলে কেন এখানে ?

লাবণ্যময়ী : আমরা কেউ আর স্বাধীন নই পরমেশ্বর
আমরা যেন সবাই পুতুল
আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মতন
একই রকম কাঁদি, একই রকম হাসি
আমাদের ভবিষ্যৎ বাঁধা দেওয়া আছে
সেই অদৃশ্য শোষক শক্তির কাছে
তাই না ?

সকলে : তাহলে আমরা কী করে বাঁচবো ?

গুপী : আমাদের ছেলেপুলে আছে।

অনন্তরাম : আমাদের স্ত্রীগণ বহুকষ্টে দিনযাপন করছে
আমরা ফিরে গেলে ওদের মুখে জুটবে অন্ন।

লাবণ্যময়ী : হতাশ হয়ো না গুপী,
নিরাশ হয়ো না অনন্তরাম
আমরা আগামী দিনের আলোকের প্রত্যাশায়
আজ শহীদ হব।

সকলে : শহীদ ! রক্ত ! মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়া !

অনন্তরাম : ময়দানে স্ট্যাচু বানিয়ে ফুলের মালা দেওয়া ?
অসম্ভব !
আমাদের শহীদের দুর্লভ ভাগ্য থেকে রক্ষা করো
আমাদের গরাদ ভাঙতে শেখাও পরমেশ্বর
তুমি জ্ঞানী, তুমি দূরদর্শী, তুমি অকুতোভয়।

[একটা গুঞ্জন ওঠে। সকলের চোখে মুখেই জিজ্ঞাসা।]

পরমেশ্বর : [প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসে]
হা হা হা হা, হা হা হা হা
কী বললে অনন্তরাম ?
আমি জ্ঞানী, আমি দূরদর্শী, আমি অকুতোভয় !
আরও কী কী বিশেষণ আছে সব বলো,
বলো হে, চুপ করে আছো কেন তোমরা ?

গুপী : আমাদের মার্জনা করো পরমেশ্বর
আমরা বেরুতে চাই এই কারাগার থেকে।

[শেকলের আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে। দরজায় আঘাতের শব্দ।]

অনন্তরাম : ওই, ওই, ওই
শুনতে পাচ্ছ পরমেশ্বর ?
মানুষ মুক্তি চায়, তারা শহীদ হতে চায় না।

[আবার নিস্তব্ধতা। আলো স্তিমিত হয়ে আসে। প্রবেশ করে জল্লাদ]

জল্লাদ ঃ [অট্টহাসি হেসে] হা হা হা হা
তোমরা মিছে জটলা করছো
চিরকালের বন্দীত্ব তোমাদের।
তোমরা বরং বিলাপ করো নিজেদের কৃতকর্মের জন্য।
শোক করো নিজেদের অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্য।

অনন্তরাম ঃ তুমি আমাদের ভয় দেখাচ্ছো ?

গন্পী ঃ আমরা আর কিছুতেই ভয় পাই না জল্লাদ
দেখছো না, আকাশে ছাতার মতো বিরাট চাঁদ
দেখছো না, বাইরে মানুষের বিশাল মিছিল !

জল্লাদ ঃ, হা হা হা হা
কবি ! তোমরা কবি নাকি হে ?
ওসব তোমাদের জন্য নয়
তোমরা কর্মেশ্বরের বন্দীশালায় চিরকালের অতিথি
হা হা হা হা।

লাবণ্যময়ী ঃ তোমার জানা শেষ জানা নয় জল্লাদ
আমরা আগামী কালের কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

জল্লাদ ঃ [ব্যঙ্গের সুরে]
শুনতে পেলে কিছু বলো

[হঠাৎ আলো স্তিমিত হয়ে আসে। হিংস্র জন্তুকে যেভাবে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে সেইভাবে বন্দীরা শিকলশূন্য হাত নিয়ে ঘিরে ফেলে জল্লাদকে। জল্লাদ কিছু বলবার আগেই মানুষেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গানের সুর বাজতে থাকে। 'আমরা হব পলাতক।' মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।]

তৃতীয় দৃশ্য

[পর্দা উঠলেই দেখা যাবে বন্দীশালার দরজা ভাঙা। দেখে মনে হয় কিছুক্ষণ আগে একটা দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। জল্লাদের ভাঙা তরবারি, তার পোশাকের

ছিন্ন অংশ ইত্যাদি পড়ে আছে আশে পাশে। বন্দীরা কেউ কোথাও নেই। প্রবেশ করে পরমেশ্বর ও লাবণ্যময়ী]

পরমেশ্বর : কী ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে।
অনেক পাতা উড়ছে এলোমেলো
কী আশ্চর্য ঝড়!
আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?

লাবণ্যময়ী : জানি।

পরমেশ্বর : কী বলো তো ?

লাবণ্যময়ী : তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছো না পরমেশ্বর
তুমি যাদের মনে করতে দুর্বল, অসহায়, কাপুরুষ
তারাই আজ জল্লাদকে পরাস্ত করে
বন্দীশালার দরজা ভেঙেছে।

পরমেশ্বর : আমার হিসেবে কেমন জানি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে লাবণ্যময়ী
এই অন্ধ ভবিতব্যের হাত থেকে ওরা মুক্তি পাবে
এ যেন ভাবতেই পারছিলাম না।

লাবণ্যময়ী : আমি জানতাম পরমেশ্বর
এই নগরে আমি থাকি জন্ম থেকে।
কর্মেশ্বরের যন্ত্রশালার সব নষ্টামি আমার জানা
কোমরে তার মৃত্যুবাণ লুকোনো তাও অজানা নয়
ছিল না শুধু সুযোগ, ছিল না সেই সমবেত সাহস।

পরমেশ্বর : আমি তো মরতে ভয় পাই না লাবণ্যময়ী
এই বন্দীশালা থেকে বেরোবার পথ জানা ছিল না।

লাবণ্যময়ী : [পরিহাসের সুরে] এখন জানলে ?
বুঝতে পারলে নিজেকে যত বুদ্ধিমান মনে করো
তা তুমি নও।

পরমেশ্বর : তুমি আমায় তিরস্কার করছো লাবণ্যময়ী ?

লাবণ্যময়ী : আমি ঠাট্টা করছিলাম পরমেশ্বর।

[খানিক্ষণ উভয়ে চুপ]

পরমেশ্বর : আজ এই ঝড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে

আমার কী বলতে ইচ্ছে করছে জানো ?

লাবণ্যময়ী : কী ?

পরমেশ্বর : তুমি ভীষণ সুন্দর
এই জ্যোৎস্নায় তোমায় আশ্চর্য মায়াবী দেখাচ্ছে ।

লাবণ্যময়ী : [ওর মুখ চাপা দিয়ে]
ওভাবে বলো না তুমি পরমেশ্বর
তুমি তো জানো, প্রশংসা আমার অনেক শোনা ।

পরমেশ্বর : [ঘনিষ্ঠ হয়ে] তুমি কঠোর হয়োনা লাবণ্যময়ী
আজকের রাতটা পরমাশ্চর্য
আজ তুমি পতিতা নও, তুমি বহুবাঞ্ছিতা নও
তুমি এক আশ্চর্য রমণী
তুমি এই বন্দীশালায় এনেছো বিদ্রোহের আগুন
তুমি ছন্নছাড়াদের জীবনে এনে দিয়েছো সার্থকতা
বাঁচার, মুক্তির, স্বাধীনতার ।

লাবণ্যময়ী : আমি স্তুতি চাই না পরমেশ্বর ।

পরমেশ্বর : আমি তা জানি
স্তুতির পাহাড় জমে আছে তোমার পায়ের তলায়
আমি তার পাথর গুণে শেষ করতে পারব না সারাজীবন
যা তোমার প্রাপ্য আমি তাই দিতে চাই ।

লাবণ্যময়ী : তুমি মনের সাম্য হারিয়ে ফেলেছো পরমেশ্বর
এখানে কেন এসেছিলে তুমি মনে আছে ?

পরমেশ্বর : আছে ।
এসেছিলাম কর্মেশ্বরের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে ।

লাবণ্যময়ী : সে কাজ তোমার শেষ হয়েছে ?

পরমেশ্বর : বন্দীশালার দরজা খোলা,
মানুষেরা আজ মুক্ত
চলো, আমরা বাইরে যাই ।

লাবণ্যময়ী : চলো ।

[ওরা এগোতে যাবে এমন সময় গুপী অনন্তরাম ও অন্যদের প্রবেশ]

গুপী : আমাদের উদ্ধার করো পরমেশ্বর।

অনন্তরাম : আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি না লাবণ্যময়ী
বন্দীশালার দরজা ভেঙেছি
কিন্তু এর পাঁচিল নিশ্ছিদ্র
বাইরে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

[বাইরে মিছিলের আওয়াজ। নানা রকম শ্লোগান শোনা যাচ্ছে। মনে হয় উত্তাল সমুদ্র বাইরে এসে তটে আছাড় খাচ্ছে।]

পরমেশ্বর : আমিও যে তোমাদের মতো বাঁধা পড়ে আছি
এই বন্দীশালায়।

লাবণ্যময়ী : তুমি বিহ্বল হয়ে পড়েছো পরমেশ্বর
এই মুহূর্তে ও-কথা তোমার মুখে মানায় না।

[বাইরে শব্দ প্রচণ্ডতর হতে থাকে। যেন ঝড় বইছে। থেকে থেকে গুপী অনন্তরাম আর্তনাদ করে বলছে 'আমরা শিকল ভেঙেছি, কিন্তু পাঁচিল ডিঙোতে পারছি না।]

পরমেশ্বর : গুপী, অনন্তরাম, এবং অন্যান্য যারা আছো
আজ তোমাদের মহত্তম স্বীকৃতির দিন
তোমরা বন্দীশালার দরজা ভেঙেছ
এর চেয়ে বীরত্বের কাজ আর কী হতে পারে ?

সকলে : আমাদের ভরসা দিচ্ছ তুমি মিথ্যা স্তোকবাক্যে
কখনো তোমার মুখে তীব্র ভৎ'সনা
কখনো নির্জলা স্তোক
কোনটা বিশ্বাস্য পরমেশ্বর ?

পরমেশ্বর : আমি তোমাদের ভোলাতে চাই নি,
এ আমার আত্মসমালোচনা,
আমি পারছি না, আমি জানি না এর পর কী ?

লাবণ্যময়ী : না, ও কথা নয়
আমাদের জানতেই হবে
প্রথম বাধা তোমরা সকলে সরিয়েছো,

বাকীটুকু তোমরাই পারবে।
পরমেশ্বর, তুমি বিহ্বল হয়ো না,
তোমার কাজ বাকী আছে।

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী,
আমি এদের নিয়ে কোন পথে যাবো ?
তুমি বলে দাও।

লাবণ্যময়ী : চলো আমরা সকলেই এগোই,
আমাদের খুঁজে বের করতে হবে
এই পাঁচিলের দুর্বলতম জায়গা
সেখানেই আঘাত করে দিতে হবে ভেঙে।

সকলে : ঠিক ঠিক
লাবণ্যময়ী ঠিক কথা বলেছে।

পরমেশ্বর : চলো, চলো, চলো,
সবাই এগোই চলো।

[সবাই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ক্যামেরা কাঁধে এক সাংবাদিকের প্রবেশ।]

সকলে : কে গো তুমি ? কে বটে হে ?

[সাংবাদিকটি কারো কথা না শুনে একটি ভালো জায়গা বেছে নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত]

সকলে : কী ব্যাপার ? ছবি তোলে কেন ?
কে গো তুমি ? এখানে এই বন্দীশালায়
ঢুকলে কী করে ?

সাংবাদিক : আমি একজন রিপোর্টার
এসেছি তোমাদের খবর সংগ্রহ করতে, ছবি তুলতে।
আজ বৃহত্তম সংবাদের দিন
সংবাদ তৈরী হয়েছে কর্মেশ্বরের বিশাল যন্ত্রশালায়।

সকলে : সংবাদ ? কীসের সংবাদ ?

লাবণ্যময়ী : তুমি কি কর্মেশ্বরের দালাল ?

সাংবাদিক : তা হতে যাব কোন দুঃখে ?
আর কর্মেশ্বরই বা কোথায় ?

ও নামে কেউ নেই, কেউ ছিল না, কেউ থাকবে না।
ওফ্ কী সাংঘাতিক স্কুপ! সেন্সেস্যানাল খবর
বন্দীরা জেল ভেঙেছে, বাইরের জনতা ভেঙেছে
পাঁচ মানুষ সমান অন্ধকারের পাঁচিল
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ

[সকলেই হৈ হৈ করে ওঠে। নানারকম কথা-বার্তার টুকরো ভেসে আসে]

পরমেশ্বর : কী বলছ হে ? সত্যি ?

সাংবাদিক : দেখুন আমরা সাংবাদিক,
বানিয়ে অনেক সময় লিখতে হয় বটে
কিন্তু অবজেকটিভ্ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য।
আমি যা বলছি সব সত্যি, একটুও বানানো নয়।
সারা শহরের মানুষ, নর-নারী ছেলে-বুড়ো
লক্ষ লোক জমায়েত হয়েছে রাজপথে।

[বাইরে জনতার আওয়াজ]

ওই শুনছেন না তার দৃপ্ত কণ্ঠের ধ্বনি।
ওফ্ আমার ইচ্ছে করছে ··ইচ্ছে করছে

সকলে : কী ইচ্ছে করছে বাপু, বলই না।

সাংবাদিক : ইচ্ছে করছে কলম ফেলে দিয়ে
ওদের দলে ভীড়ে যাই
বলি, আমরাও আছি তোমাদের পক্ষে।

[জনতার হর্ষধ্বনি]

পরমেশ্বর : কর্মেশ্বর বাধা দিল না ?

সাংবাদিক : কর্মেশ্বর বলে কেউ নেই।
কতগুলি ভীরু, কাপুরুষ শোষকের দল
ওই নামে এক অদৃশ্য শক্তি দাঁড় করিয়ে
চরম অত্যাচার চালিয়েছিল এই যন্ত্রশালায়
আজ মানুষের দুর্বার প্রতিরোধের আঘাতে
ভেঙে গেছে এই অন্ধকারের দুর্গ।

[সকলের হর্ষধ্বনি]

মানুষ আজ স্বাধীন, মুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী

[সকলের আবার হর্ষধ্বনি। সাংবাদিক হাতঘড়ি দেখে]

ওফ্ আটটা বেজে গেছে,
এয়ারমেল এডিশনে খবরটা ধরাতেই হবে।

[লাবণ্যময়ী ও পরমেশ্বরের একটা ছবি তুলে নিয়ে চলে যায়।]

সকলে : আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত পরমেশ্বর
আমরা মুক্তি পেয়েছি লাবণ্যময়ী।

লাবণ্যময়ী : হ্যাঁ অনন্তরাম গুপী
তোমরাই এই বন্দীশালার দরজা ভেঙেছো।

গুপী : পরমেশ্বর আমাদের জাগিয়েছিল

অনন্তরাম : লাবণ্যময়ী দিয়েছিল আমাদের সাহস।

পরমেশ্বর : তোমরা সকলে নিজেরাই জেগেছিলে
নিজেরাই অর্জন করেছিলে সাহস।

[জনতা আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে বেরিয়ে যায়। শূন্য মঞ্চ। শুধু লাবণ্যময়ী আর পরমেশ্বর। আকাশে চাঁদ]

পরমেশ্বর : লাবণ্যময়ী !

লাবণ্যময়ী : কিছু বলবে পরমেশ্বর

পরমেশ্বর : তোমাকে আজ আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে লাবণ্যময়ী
মনে হচ্ছে তুমি এক অসামান্যা নারী
তোমার চোখে মানুষের বিশ্বাসের স্বপ্ন
তোমার দেহে চিরকালের আশার অভিব্যঞ্জনা।

লাবণ্যময়ী : [আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে]
পরমেশ্বর আজ তোমাকে ফেরাবো না।
আমার চির-বঞ্চিত জীবনে তুমিই ফোটালে
ভালবাসার অম্লান কুসুম

[পরমেশ্বর এগিয়ে এসে লাবণ্যময়ীকে আলিঙ্গন করে। আনন্দে লাবণ্যময়ীর চোখে আসে জল।]

আজ বধ্যভূমিতে আমাদের বাসর, পরমেশ্বর।

পরমেশ্বর : হ্যাঁ লাবণ্যময়ী,
আজ মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আমাদের চিরকালের মিলন
চলো আমরা মানুষের সমুদ্রের কাছে যাই।

[ওরা ধীরে ধীরে এগোয়। বাইরে জনতার ধ্বনি।]

প ট ক্ষে প

পদধ্বনি পলাতক

গিরিশংকর
বন্ধুবরেষু

চরিত্র লিপি

সুহাসিনী	শোভন
দীপু	তপু

প দ ধ্ব নি প লা ত ক

[সাধারণ মধ্যবিত্তের ঘর। রাত হয়েছে। সুহাসিনী তাঁর ছেলের প্রতীক্ষায় বসে। জানালার কাছে গিয়ে কখনো দাঁড়ান আবার ফিরে আসেন]

সুহাসিনী : এত রাত হল, এখনো ছেলের দেখা নেই।
বলেছিল, সকাল সকাল ফিরবে।
প্রতিদিন এই বসে থাকা,
প্রতিদিন এই জেগে থাকা
ঈশ্বর, তুমি আমাকে কী পরীক্ষায় ফেললে ?
আমি যে মা, দশমাস ওকে গর্ভে ধরেছি
আমি তো ওর জন্য প্রতীক্ষা না করে পারি না।

[একটি মেয়ের প্রবেশ, বছর কুড়ি বয়স। দীপ, সুহাসিনীর মেয়ে]

দীপু : মা, তুমি এখনো বসে আছো ?
ঘুমুবে না তুমি ?

সুহাসিনী : তোরা ঘুমুগে দীপু
আমার ঘুম আসবে না রে।
বসে আছি কখন সমীর ফেরে
ও যে আজ আসবে বলে গেছল।

দীপু : হ্যাঁ, আজ তো সোমবার ভুলেই গিয়েছিলাম।
দাদা এলেই আজ ঝগড়া করব কিন্তু মা—

সুহাসিনী : কেন রে ? ঝগড়ার আবার কী হল ?
তোরা দুটিতে সেই ছোটবেলায় যেমন
খেলার পুতুল নিয়ে ঝগড়া করতিস
এখনো তেমনি করবি নাকি ?

দীপু : না মা, দাদা বলেছিল,
আমাকে পরীক্ষার ক'টা দিন পড়াবে
একদিনও কথা রাখেনি।
বললে এক জবাব, ও আর এমন কি পড়া
একদিনেই হয়ে যাবে।

সুহাসিনী : ওই ওর এক কথা।
দেখিসনি, নিজের বেলাতেও অমনি
বই-টই কখন যে পড়ে
কিন্তু ঠিক পরীক্ষায় পেত জলপানি।

দীপু : অমনি ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ
আমরা বুঝি আর পড়ি না!

সুহাসিনী : পড়িস বলেই তো বলছি
ওর কেমন না পড়েই সব প্রাইজ পাওয়া হত।

দীপু : মোটেই না, দাদার পড়া আমি দেখেছি
ভীষণ স্মরণশক্তি। একবার পড়লেই ব্যস্—
রাত হলেই ওর পড়ার সময় হয়
সারাদিন আড্ডা, টই-টই, যেন কিছুই না
গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো।

সুহাসিনী : হ্যাঁরে দীপু, সমীর বলে গেছল কিছু
কখন ফিরবে?

দীপু : সেদিন খুব হন্তদন্ত হয়ে গেল বেরিয়ে
বলেছিল কাজ আছে।
কী সে কাজ?
সবাই সময় মতো বাড়ি ফেরে
ওরই যত কাজ বাড়ি ফেরার সময়।

সুহাসিনী : [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে]
বাড়ি ফেরা? ঘরে ফেরা?
ঘরে ফিরে মায়ের কাছে বসে না খেলে
ওর পেট ভরত না ছোটবেলায়।
হ্যাঁরে তোরা সব বড় হয়ে পাল্টে গেলি?

দীপু ঃ আমি মোটেই পাল্টাইনি মা
তোমার কাছে না ঘুমুলে
আমার কেমন ভয় করে !
সুহাসিনী ঃ শোনো মেয়ের কথা—
ভয় কী রে তোর ?
দীপু ঃ মা গো, আমার আজকাল ভীষণ ভয় করে
মনে হয় যেন তোমাকে হারাই বা কখন।
সুহাসিনী ঃ হারাবি না রে, হারাবি না পাগলী মেয়ে
মাকে হারাবি কেন ?
আমি যে পক্ষিণী মা তোদের,
ডানা দিয়ে ঘিরে রাখি সর্বক্ষণ।
কত কষ্টে তোদের মানুষ করেছি
সেদিনের সাক্ষী আছে কেউ ?
জানে শুধু এ বাড়ির ইঁটকাঠ প্রতি ধূলিকণা।
আমি যে তোদের মা, পেটে ধরেছি তোদের
তোদের দুটিকে ভর করে আমি বেঁচে আছি।
দীপু ঃ মা, একটা কথা বলবে ?
সুহাসিনী ঃ বল্ কী বলবি ?
দীপু ঃ তোমার নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই ?
নিজের মতো করে চাওয়া, কিছু পাওয়া ?
সুহাসিনী ঃ রাখ্ তোর হেঁয়ালি কথা
তোরা সব বই পড়ে পড়ে
দার্শনিক হয়ে উঠ্‌ছিস যেন।
দীপু ঃ না মা, সত্যি করে বলো
এক একদিন তোমাকে যখন চোখ বুজে
প্রার্থনা করতে দেখি, তখন মনে হয়
সুহাসিনী ঃ কী মনে হয় ? তুই তাও দেখিস না-কি ?
দীপু ঃ দেখি বৈকি। তোমার ওই প্রার্থনার ভঙ্গি
ভীষণ ভালো লাগে আমার।
আমার মনে হয়, পৃথিবীর সব পবিত্রতার

প্রতিমূর্তি তুমি। তুমি শুধু আমাদেরই মা নও
তুমি যে সবাকার মা,
তুমি যেন অগণিত সন্ততির পালয়িত্রী মা,
তোমার নিমীলিত চোখে পৃথিবীর প্রগাঢ় সান্ত্বনা
তোমার দু'হাতে যেন আমাদের সমর্পিত স্তব।

সুহাসিনী : কী জানি বাপু, কী সব বলতে শুরু করলি তুই!
আমি শুধু এই বুঝি, তোদের তরে আমি
যতদিন দেহে থাকে প্রাণ, তোদেরই কল্যাণ
চেয়ে দিনরাত প্রার্থনায় সমর্পিত হই।

দীপু : [মাকে জড়িয়ে ধরে]
মা গো, তোমাকে কী করে বোঝাব
তোমার মতো মা আমার, সে এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

সুহাসিনী : ছাড় বলছি, ধিঙ্গি মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো, ছাড়।
[দীপু মাকে ছেড়ে দেয়]

দীপু : আচ্ছা যাও, যাই বলো তুমি
তোমরা আছো বলেই না আমরা বড় হয়ে উঠি
শ্বাস নিই, স্বপ্ন দেখি
এইভাবে আমরা বাঁচি শুধু মায়েদের তরে
দাদা তো সেই কথা বলে।

সুহাসিনী : বলে বুঝি? ও তো আজকাল কথাই বলে না
কী যে ভাবে, কী যে করে রাতদিন
বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ?
[দেওয়াল ঘড়িতে এগারোটা বাজে]
এগারোটা বাজল। এখনো ফিরল না।

দীপু : মা অত ভাবছো কেন? তুমি ভেতরে যাও
আমি ততক্ষণ বসি এখানে।

সুহাসিনী : কী জানি, দেরী হলেই আজকাল
কেমন জানি ভয় হয়।

দীপু : তোমার ভয় করলে চলবে কেন মা?
আমরা যে তোমাকেই ঘিরে আছি।

সুহাসিনী ঃ তাই থাকিস্ দীপু,
আমি আসি।

[সুহাসিনী ভেতরে চলে যান। দীপু একটা বই নিয়ে পড়তে থাকে। দরজায় শব্দ]

দীপু ঃ কে ?

[সমীরের বন্ধু শোভনের প্রবেশ]

শোভনদা, তুমি এত রাতে ?

শোভন ঃ আসতে নেই বুঝি ?

দীপু ঃ আমি কি তাই বললাম ?
দাদা কোথায় ?

শোভন ঃ সমীর ফেরেনি ? আমি তো এসেছি
ওরই খোঁজে।

দীপু ঃ তোমরাই তো জানো
মা কতক্ষণ থেকে বসে আছেন
আচ্ছা তোমরা কী সবাই ও রকম ?

শোভন ঃ কী রকম ? আমাকে কি আর পাঁচজনের
মতো দেখাচ্ছে না ? এই যে আমার সামনে
দীপা রায় বলে মেয়েটি দাঁড়িয়ে
তার কাছে এমন কি বেমানান আমি ?

দীপু ঃ ঠাট্টা রাখো তো !
জানো, দাদা সেই সকালে বেরিয়েছে
এত রাত হল, ফেরবার নাম নেই।
এদিকে শহরে গণ্ডগোল, গুজব সর্বত্র
কী করে থাকি আমরা নিশ্চিন্তে ঘরের কোণে
তুমিই বলো তো।

শোভন ঃ দীপু, একটা কথা বলব ?

দীপু ঃ বলেই ফেলো।

শোভন ঃ ঠাট্টা নয় দীপু,
এখন থেকে বোধ হয়
মায়েদের প্রতীক্ষাই শুরু হল,

পথ এত দীর্ঘ, এত আঁকাবাঁকা
আমরা কি আর সহজে পৌঁছুতে পারব ?

দীপু : শোভনদা, তোমাদের কথাগুলো আজকাল
যেন আর কথা মাত্র নয়।
একটি শব্দের মধ্যে অজানিত গভীর সংকেত
বহুমুখ তার—কোথাও আলোকের উজ্জ্বলতা,
কোথাও আঁধার—তাকে ধরি সাধ্য নেই মোটে।

শোভন : আমরাও কি সব কথার সব অর্থ বুঝি ?
মনে হয় এক একটি শব্দ যেন বিস্ফোরক কোনো শক্তি
আমরা নিজেরাই কি জানি, কেন বলি, কাকে বলি ?
কথা যেন কুহকিনী—তার টানে চলি অনির্দেশ্য পথে।

দীপু : অনির্দেশ্য কেন ? কম্পাসবিহীন পোতে
অজানা সমুদ্র পাড়ি দেওয়া ?

শোভন : অনির্দেশ্য এ কারণে আমরা ঠিক পরিচিত নই
জানো নিজেদেরই কাছে।
কী করে জানবো এই বাইরের অজানা জগৎ
সে তো এক মহাদেশ, তার কত বিচিত্র উপল
ঘিরে রাখে বালুতট, সাগরের সীমাহীন নীল
যেন এক অজ্ঞাত সংকেত, হাতছানি দিয়ে ডাকে
ওপারের অজানিত দ্বীপপুঞ্জে থাকে অপেক্ষায়।

[বাইরে শব্দ যেন বহুলোক ছুটোছুটি করে পালাচ্ছে]

দীপু : ও কীসের শব্দ শোভনদা ?
মানুষের পায়ের শব্দ, যেন তারা অস্থির আবেগে
খোঁজে কোনো নিরাপদ সান্ত্বনা, আশ্রয়।

শোভন : দীপা, তুমি তো সব জানো
কেন এই বিক্ষোভ, সংক্ষোভ,
কেন পদধ্বনি পলাতক—
বার বার আঙিনার পাশ দিয়ে চলে যায়
মানুষের ভবিতব্য, চিন্তাভাবনা, আশা ও নিরাশা
সব আজ বিক্ষিপ্ত চঞ্চল

আমরা আর নীরব দর্শক নই, নই আর
সামান্য পুতুল। আমাদের স্থিরতা কোথায় ?

দীপু : কী ভাষায় কথা বলো তুমি শোভনদা
আমরা তবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি ?
আমাদের বৃত্তটুকু যেন কারা কবে চকখড়ি দিয়ে
এঁকে রেখে গিয়েছিল ; তারই মধ্যে ঘুরপাক খাই
নিশ্চিত সান্ত্বনা খুঁজি। বৃত্তের বাইরে জীবন
কেন এত তোলপাড় ? কি তার জিজ্ঞাসা ? কার কাছে ?

শোভন : তাও বলে দিতে হবে ? উত্তাপেই পরিচয়
আগুনের। তাইতেই আমরা বুঝি কী ভীষণ
জতুগৃহে বন্দী হয়ে আছি সব ; কী ভীষণ
ছলনায় আমাদের প্রিয়জন নিশ্চিন্তে ঘুমোয়—
শিয়রে তাদের জাগে কী ভীষণ ষড়যন্ত্র
জীবনের প্রতিবাদী। আমাদের জীবনে বুঝি
মুক্তির নক্ষত্ররাজি ঢেকে গেছে কালো মেঘে
অরণ্যেও দাবানল। পথ খুঁজি, কোথায় সে পথ ?

দীপু : বাঃ রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বসো তুমি
মাকে ডাকি, চা দিয়ে যেতে।

শোভন : ওই সব সৌজন্যের দরকার নেই
বসো তুমি। আমিই ডাকছি
[দরজার পাশে গিয়ে]
মাসিমা, আমি শোভন
ভয়ানক তৃষ্ণার্ত আছি। চা দেবেন নিজ হাতে।
[ফিরে এসে]
জানো ঠিক পৌঁছে যাবে। মাসিমার হাতে চা
খেয়েই অপার তৃপ্তি।

দীপু : একশোবার মানি।
মা আছেন বলেই আমরা আছি।

শোভন : মায়েরাই সব। সে জন্যেই তো সবচেয়ে
সুন্দর প্রতিমা, ভাবনা, বোধ, ভালোবাসা

জননীর রূপ পায়। আমাদের রক্তে বহে
তারই সত্তা। অণুতে অণুতে তারি ভাবনা
শিহরণে অস্তিত্ব দোলায়। আমাদের প্রেরণা,
তৃষ্ণা, অবাধ্যতা পাগলামি সবই, ফের
ফিরে আসা, জননীর গণ্ডী ঘিরে।
এই যে আসছেন তিনি

[সুহাসিনী চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢোকেন]

সুহাসিনী : কী সব আবৃত্তি করছিস ?

শোভন : আবৃত্তি নয় মাসিমা, স্তব।

দীপু : জানো মা শোভনদাও আমার সঙ্গে
একমত।

সুহাসিনী : কীসের ?

দীপু : বিষয় : মাতৃবন্দনা।

[দীপা ও শোভন হেসে ওঠে]

সুহাসিনী : ওই এক কথা। তোদের ছেলেদের
কথায় বিশ্বাস কি ?

শোভন : অবিশ্বাসী হলুম কখন ?

সুহাসিনী : [দীর্ঘশ্বাস ফেলে]
আমাদের কষ্ট দিতেই তোরা ভালোবাসিস্
আমাদের আর কী-ই বা আছে
শুধু তোরা ছাড়া ?

শোভন : জানিনে কোথায় ব্যথা দিলুম আপনাকে।

দীপু : মা, তুমি সব সময় এত ভেবো না।
আমাদের একটু ভাবতে দাও
শিখতে দাও জীবনে চলার···

সুহাসিনী : আমি কি সাধ করে ভাবি ?
তোরা ভাবিয়ে তুলিস্ বলেই এত ভাবনা।

শোভন : দীপু, আমি যেন কোথায় এসে পড়লুম
আসামীর মতো কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে !

দীপু : আসামী আমরা সবাই

আমরা ভুল করি, ভুল স্বপ্ন দেখি
তাই পদে পদে আঘাত পাই
দোষী তো আমরাই ঃ

সুহাসিনী ঃ শোভন, তুই তো জানিস আমার সমস্ত ভয়
আজ শুধু সমীরকে ঘিরে।

শোভন ঃ সমীরকে ঘিরে! ওর মতো বাধ্য, ভদ্র
ভালো ছেলে আমাদের পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে
আর কেউ নেই। ওকে নিয়ে কারু কোনো
ভাবনা থাকতে পারে, ভাবতেই পারি না আমি।

সুহাসিনী ঃ ভাবনা যে কী ভীষণ—আমি তোকে
বোঝাতে পারব না শোভন।

দীপু ঃ শোভনদা, দাদাকে তো তুমি জানো
যখন যেটাকে জানে স্থির লক্ষ্য বলে
তার জন্য সব কিছু করতে পারে অনায়াসে।
এখন কী যে ভাবছেন দাদা তাই নিয়ে
মায়ের দুশ্চিন্তা। [একটু থেমে]
তোমার সঙ্গে কবে শেষ দেখা হয়েছে ?

শোভন ঃ তা হবে মাসখানেক। আগেকার মতো
রোজ রোজ আর দেখা হয় না।
আমি থাকি বাইরে বাইরে, ট্যুরের কাজকর্মে।
তবে দেখেছি ওকে ইদানীং কী এক অন্যমনস্কতা
ঘিরে রাখে সর্বক্ষণ। হয়তো বা অন্য কোনো
মনস্কতা অনেক গভীরে টেনে নেয় ওকে।
সবকিছু বলতে চায় না, কিছু বা গোপন রাখে।

সুহাসিনী ঃ শোভন, আর বলিস্‌নে তুই
আমি শঙ্কিত হয়ে উঠি!
সমীর কী এমন ভুল করবে ?
সে তো জানে তার মাকে
সে কি এমন ভুল করবে ?

[এমন সময় গীটার হাতে দীপুর ভাই তপুর প্রবেশ]

তপন্ : না মা, ভুল বলতে শুধু আমি
ভুলের রাজত্বে বাস করে ভুল স্বর্গে
করাঘাত করি। চলে যাই ভুল ঠিকানায়।

দীপন্ : তপন্, তোদের নাটকের মহলা এতক্ষণে
শেষ হল? বাড়ি ফেরার নাম করিস না।

তপন্ : শোভনদা, তুমিই বলো, পরশু
আমাদের নাটক, রিহার্সাল চলছে জোর
একটু দেরি তো হবেই।

শোভন : নাটক? এখনও নাটক-পাগল আছিস্ তুই

তপন্ : নাটকেই তো সব। দেখছো না সর্বত্র
কেমন নাটক জমে? সকলেই অভিনেতা
সকলেই চেয়ে থাকে প্রম্পটারের দিকে
উৎকীর্ণ, উদ্‌গ্রীব, সংলাপের হের-ফের
এতটুকু হতে নেই, যেন পোষা তোতাপাখি
অথচ কী সাজ দ্যাখো—
সকলেই হতে চায়
ট্র্যাজেডির মহৎ নায়ক।

শোভন : ট্র্যাজেডির মহৎ নায়ক!

সুহাসিনী : ওদের কথার জ্বালায় আমি বোবা
হয়ে যাই। ওরা যে কী বলে আর কী
বোঝাতে চায় তার হদিশ পাইনে।

তপন্ : তোমার বোঝার দরকার নেই
একদিন ছিল যখন তোমরাই
আমাদের সব চিন্তা ঘাড়ে নিয়েছিলে
এখন আমরা ভাবতে শিখেছি, সুতরাং—

দীপন্ : সুতরাং কি?

তপন্ : সুতরাং আমরাই ভাবব।
কী বলো মাদার?

[মাকে দু'হাতে ধরে একপাক ঘুরে নেয়]

সুহাসিনী : ছাড় বলছি লক্ষ্মীছাড়া

এই তোর আদর খাবার সময় ;

[তপু হাসতে হাসতে ছেড়ে দেয়]

তোরা বোস্. আমি যাই ভেতরে
এখনো অনেক কাজ বাকী।

[সুহাসিনী চলে গেলেন]

তপু : তুমিই বলো শোভনদা,
আমি কী করে সময় কাটাব ;
জানো তো, গান বাজনা ভালোবাসি চিরকাল
কলেজে প্রাইজ পেতুম, পাশ করে ঠায় বসে আছি
নির্জলা বেকার, কোনো কাজ নেই।

শোভন : কাজ ? মানুষের, যুবকের লক্ষ লক্ষ উদ্‌গ্রীব
অলস হাত। কাজ চাই, কাজ চাই,
কাজ করে বিকশিত হতে চাই,
বাগানে ফোটাতে চাই সুরভিত ফুল
দিতে চাই নদী-বাঁধ, পৃথিবী বিদীর্ণ করে
এনে দিতে পারি এক অনন্ত সম্পদ
এ চাওয়ার উত্তর মেলে না।

দীপু : কাকে কী বলছো শোভনদা
তপুর মনে কোনো প্রশ্ন নেই
সে বোঝে শুধু আমোদ।

তপু : আমোদ [হেসে]
নুনা ! ক্ষমা করলুম তোকে দিদি
তবে কথাটা সংশোধন করে নিস—
আমোদ নয়, আনন্দ। আমোদ জিনিসটা
ক্ষণিকের, স্বল্পজলের বুদ্বুদের মতো।
আনন্দ গভীর তাই চিরস্থায়ী। অতল জলের
উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গের নৃত্যের মতো।
যাই বলো শোভনদা, এ ছাড়া আমি আর
কী করতে পারতুম ?
দাদার মতো কর্মী নই, দেশ সমাজ ইত্যাদির

ভাবনা বয়ে বেড়াবো। দীপুর মতো নম্র নই
সহজে সব স্বীকার করে নেব।
বলতে পারো, আমি আর কী হতে পারতুম ?

[শোভন গম্ভীরমুখে ওপরের দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ স্তব্ধতা]

শোভন : তপু, এ জিজ্ঞাসা আমারও।
তুমি বা আমি বা দীপু, আমরা
আর কী হতে পারতুম ?

দীপু : কী হতে পারতুম তার শেষ কথা
বলার সময় এখনো আসেনি শোভনদা।

তপু : দীপু, তুইও বলিস এ কথা
দাদা বললে মানাত।

দীপু : হয়তো মানাত। এত বড় কথা বলার
মতো কিছু করিনি শোভনদা।
তবু, তবু মনে হয়
আমরা কী হতে পারতুম, তা কোনোদিনই
জানাতে পারব না।

শোভন : কী হতে পারতুম তা জানিনে বলেই তো
হওয়ার জন্য এত চেষ্টা, এত আকুলতা
প্রতিদিনের আমি প্রতিদিনের আমিকে
নতুন করে তৈরি করে। আজকের আমি
আগামীকালের আমির সামনে
অপরিচিতের মতো দাঁড়ায় অপ্রস্তুত মুখে।

তপু : এবং সেই আমির সঙ্গে আর সবার
কোনো মিল নেই বলে মনে হয়।
তাই তো বলবে তোমরা ?

দীপু : না রে, সবার সঙ্গে মিলিয়েই তো
নিজেকে দেখি আমরা।
নইলে নিজেকেই বা আলাদা করে
ভাবতে পারতুম কী করে।

শোভন ঃ ঠিক বলেছো দীপু
সবার সঙ্গেই আমি বা আমরা
অথচ সবাইয়ের জন্য ক'জনই বা আমরা বাঁচি ?

তপু ঃ শোভনদা, তুমি বড্ড ভাবিয়ে তোলো মাঝে মাঝে
জানো, আমরা যে নাটকটা করছি
তার গল্পটাও এমনি এক মানুষকে নিয়ে ;
সে নিজের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে
তার পারিপার্শ্বিক, তার সংস্কার, তার আনুগত্য
প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল তার।
ক্ষতবিক্ষত হয়ে কাঁটা পায়ে চলে তার পথ।
স্নেহ সে পায়নি কোনোদিন
অথচ সে ছিল জানি স্নেহের কাঙাল,
ভালোবাসা পেলে হতে পারত বিজয়ী সম্রাট।
এক অন্যায় বোধে
সারা জীবন সে জ্বলল ঃ
অথচ কোনো পাপ বা অন্যায় করেনি সে কোনোদিন
আঁতুড়ে মা মারা গিয়েছিলেন
ওর ধারণা হল ওর জন্মের জন্যই
মা তার চলে গেলেন।
এই তার দোষ—
তোমার কেমন মনে হয় নাটকটা ?

শোভন ঃ খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। জানো তপু, আমরা সবাই
কিছু না কিছু অপরের অস্তিত্বের দর্পণ
আমরা কেউ একেবারে উটকো লোক নই
সকলেরই ছায়া পড়ে আমাদের মনের দর্পণে।
তাই তোমার নাটকের মানুষও ব্যতিক্রম নয়
তার যুদ্ধ আমাদেরও, দুঃখ তার আমাদেরও—
আমাদের সকলেরই সমান্তরাল জীবনযাপন।

তপু ঃ তবেই দ্যাখো, আমি শুধু আমোদ চাইনে।
আমাদেরও আছে চিন্তা জীবনকে নিয়ে।

দীপু : বুঝেছি। অনেক হয়েছে তোর কথা
আমার ঘাট হয়েছে বাবা
তোমাকে নিয়ে আর কথা বলব না।

তপু : ওটা তোর রাগের কথা
হেরে গিয়ে হার মানতে অস্বীকার করা।
যাকগে তোকে ক্ষমা করলুম।

[সুহাসিনীর প্রবেশ]

শোভন : মাসিমা দেখুন, দুটিতে কী
তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

সুহাসিনী : ওই তো এক ধারা ওদের
তর্ক করে হারজিৎ খেলা।

শোভন : না মাসিমা, এ যুদ্ধে হারজিৎ নেই
শুধুই কথা দিয়ে কথা রোখা, বাস্।

তপু : ভুল বললে শোভনদা
আমি কিন্তু জিততেই চাই।

দীপু : তা তো দেখতেই পাচ্ছি

তপু : মা, দেখছো, দীপু তখন থেকে
আমাকে ডাউন দিতে চাইছে।

[দীপু হেসে ওঠে। তপু ও শোভনও যোগ দেয়
বাইরে অস্পষ্ট মিছিলের শব্দ]

সুহাসিনী : ও কিসের শব্দ শোভন ?

শোভন : প্রতিবাদের। মাসিমা, সর্বত্র একই
প্রতিবাদ। জীবনের অপচয়, অন্যায় আর
অসঙ্গতির বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ।

দীপু : এক একদিন মনে হয় জীবনের
কোনো মানেই হয় না, শোভনদা।

তপু : রাখ তো তোর বাজে কথা।
জীবন কি পড়া পুঁথি ? তোর সব
জানা হয়ে গেছে ? কী জানিস্ তুই
জীবনের ? কতটুকু অনাবৃত আছে তোর কাছে ?

দীপু ঃ যতটুকু পেয়েছি এই সময় সীমায়।

শোভন ঃ প্রতিদিনই জীবনের অভিযান,
জীবন তো মহানদী, অজানা স্রোতের টানে
বলে চলে নিরুদ্দেশ সাগর সন্ধানে।

সুহাসিনী ঃ কী জানি বাছা, কিছুই বুঝিনে।
আমরা কতটুকু আর চেয়েছিলাম জীবনের কাছে ?
সুখ নয়, সমৃদ্ধি নয়, শুধু স্বস্তি, শান্তির কামনা

[মিছিলের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়]

তপু ঃ শোনো মা, তুমিই তো আমাদের সর্বস্ব,
শান্তি ও স্বস্তির দ্বীপ। জীবনের উত্তাল তরঙ্গে
হাবুডুবু খেয়ে ওইখানে ফিরে পাই
আশ্বাসের পলিমাটি, শ্যামল বিস্তার।

সুহাসিনী ঃ আমার তো স্বস্তি নেই !
সমীর এল না আমি ভয়ে মরি।

তপু ঃ ভয় ? মানুষের নিত্যসঙ্গী ভয়কে
তাড়াব বলেই যত চেষ্টা, যূথবদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী
ঘিরে রাখে মানুষের একক অস্তিত্ব।

শোভন ঃ ভয় কেন মাসীমা ? জীবনে বিশ্বাস
রাখি, জয় হবে ভয়।

সুহাসিনী ঃ তাই যেন হয়।

তপু ঃ জীবনের উজ্জ্বলতা, নিষ্পাপ মুখশ্রী তার
আমাদের হৃদয় দর্পণে ভাসে অনুপম আলো।
আমাদের আর কিছু চাওয়া নেই, জীবনের সফলতা ছাড়া।

সুহাসিনী ঃ [উৎকণ্ঠিত হয়ে] সমীর এলো না এখনো ?

শোভন ঃ সমীরের প্রতিশ্রুতি জীবনের প্রতি,
ভুল সে করবে না কোনোদিন।

সুহাসিনী ঃ সমীর আমাদের সবটুকু আশা নিয়ে
রয়েছে দাঁড়িয়ে। তার কাছে আমাদের
প্রত্যাশার অন্ত নেই।

শোভন ঃ [ঘড়ি দেখে] রাত হল। আমি এখন চলি মাসিমা।

সুহাসিনী : এসো বাছা ।

[শোভন চলে যায় । ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে]

তপু : মাগো, তুমি আমায় বিশ্বাস করো না,
আমি হেসে খেলে চলি বলে ?

সুহাসিনী : তুই তো এখনো অবুঝ । কী জানিস তুই ?
কীই বা করতে পারিস্ ?

তপু : [হেসে] হে মুগ্ধা জননী, এখনো আমাকে
শিশু ভাবো !

দীপু :, তোমার চলন বলনেই তার প্রকাশ ।

তপু : আমাকে কী কী প্রমাণ দিতে হবে
বয়স্ক মননের, বলো তুমি !

সুহাসিনী : রাখ বাপু, কিছুই করতে হবে না তোর
এবার ভেতরে যা ত ।

তপু : যা আদেশ । মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য ।

[তপু চলে যায় । খানিকক্ষণ স্তব্ধতা]

দীপু : মা

সুহাসিনী : [অন্যমনস্কভাবে] কিছু বলবি ?

দীপু : শোভনদার কথা থেকে বুঝি, ভীষণ এক
জটিল প্রশ্নে আমরা সব জড়িয়ে পড়েছি
দাদা বুঝি তারই জন্য এমন উতলা ।

সুহাসিনী : কী সে জটিল প্রশ্ন যার জন্য সব কিছু ভুলে
সমীর আমার ঘোরে পথে পথে ?
কী এমন বড় কাজ মায়ের চোখের জলে
ধুয়ে মুছে যায় না এখনো ?

দীপু : আমি সব বুঝিয়ে বলতে পারব না তোমায় ।
আমিই কি সব বুঝি ? যেন এক আলোক-আঁধারে
ঘোরা—যেন তাকে বুঝেও বুঝি না ।
মনে হয় যেন তা রক্তেরই অঙ্গীকার
জননীর ঋণ সেও, তবে তার পৃথক চেহারা ।

[বাইরে আবার শব্দ। যেন অনেক মানুষ চলেছে।
অস্পষ্ট আওয়াজ কানে ভেসে আসে]

সুহাসিনী : ও কীসের শব্দ ? মিছিলের পায়ে পায়ে
তবে কি আমারই সন্তানের পায়ের শব্দ শুনি
বল্ তুই, স্পষ্ট করে বল্
লুকোবি না কিছুই আমায়।

দীপু : জানি নে মা। হয়তো বা তাই
নিঃসঙ্গ মানুষ চায় একাকীত্ব কেবলি ঘোচাতে।
মানুষেরই পদশব্দে কেঁপে ওঠে মাটি।

সুহাসিনী : দীপু কী বলিস্ তুই ?

দীপু : হ্যাঁ মা—আমাদের ক্ষুদ্র সুখ,
মায়া ও মমতা, সব যেন তারই তরে করুণ প্রস্তুতি।

সুহাসিনী : এরি জন্যে এত কষ্টে তোদের ধরেছি পেটে ?
এরি জন্যে এত কান্না, এত দুঃখ পাওয়া ?

দীপু : হয়তো বা এরই নাম জীবন—পূর্ণতা
বৃত্ত পূর্ণ হয়ে আসে।

সুহাসিনী : [অশ্রুভরা চোখে] দীপু, আমাদের এই ভবিষ্যৎ
মা হওয়া মানে আজীবন জ্বলা !

[দীপু নিরুত্তর। একটা বিষণ্ন করুণ আবহাওয়া
ঘরটিকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখে]

দীপু : তোমাকে আমি আর কী বলব মা,
তুমিই আমাদের এনেছো পৃথিবীতে
তোমার কাছে আমরা বাঁধা পড়ে আছি রক্তের ঋণে।

সুহাসিনী : এই তার শোধ ?

দীপু : জানিনে মা, আমরা যেন বালি দিয়ে ঘর গড়ি
স্নেহাতুর মায়ের আঁচল ঘিরে কতটুকু তাকে রাখা যায় ?
জীবনের জটিলতা আমাদের জড়ায় পাকে পাকে
আমরা সেই বন্ধন ছিঁড়ে প্রসন্ন উদার সূর্যালোকে
পৌঁছুতে পারি না।

সুহাসিনী : মন তো মানে না দীপু,

আমাদের কীই বা আছে, শুধু এই অন্ধ অবুঝ স্নেহ ছাড়া ?
কীই বা দিয়েছি তোদের, শুধু এই আকুলতা ছাড়া ?
কীই বা পেয়েছিস্ তোরা, শুধু এই
দুঃখ-ঘেরা জীবনের সন্তাপ-উত্তল ছোঁয়া ছাড়া ?

দীপু : মাগো অমন করে বলো না তুমি।
তোমাকে পেয়েই আমরা খুশি,
আমরা কৃতজ্ঞ রয়েছি জীবনের কাছে
শুধু তোমারই তরে।
জীবন সুন্দর তো জানি।

[তপুর প্রবেশ]

তপু : এই তো ঠিক বুদ্ধিমতীর মতো কথা,
দ্যাখো মা, দীপু নিজে যা বলে
তার সঙ্গে আমার কোনোই অমত নেই।
তবু ও ভাবে আমি শুধু আমোদ-কাঙাল।

সুহাসিনী : তপু তুইও কি কিছুই বুঝবি না ? সমীর ফেরেনি এখনো
একটু খোঁজ নিয়ে আয়।

তপু : দাদা ফেরেনি ? কেন ফেরেনি ? এখনি তো ফেরার সময়।
যাই আমি—

[যেতে উদ্যত। গম্ভীর মুখে শোভনের প্রবেশ]

শোভন : তোমার আর যেতে হবে না তপু।

তপু : কেন ?

শোভন : সমীর ফিরবে না।

সুহাসিনী : ফিরবে না !

[আর্তকান্নায় ভেঙে পড়েন সুহাসিনী]

শোভন : হ্যাঁ মাসিমা, এ তার দুস্তর যাত্রা শুরু হল।
মানুষের ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা, আকূতি
মানুষের অস্তিত্ববিচ্যুতি, এই সব প্রশ্ন নিয়ে
যারা ভাবে, তাদেরই মিছিল চলে অন্তহীন
স্রোতের মতন—সমীর তাদেরই দলে
সব একাকার মুখ, ওরা ফিরবে না।

সুহাসিনী : সমীর আমার সমীর [কান্না]

দীপু : দাদা [কান্না]

শোভন : মিছিলের সবচেয়ে দৃপ্ত মুখ যার
কোনো কান্না আজ তাকে আর ফেরাবে না।

প ট ক্ষে প

নিহত গোধূলি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক
প্রিয়বরেষু

চরিত্র লিপি

সৈকত

মুক্তি

অরুণ

নিহত গোধুলি

[সমুদ্রতীর। এইমাত্র ট্রেন থেকে নেমে সেখানে এলো শুক্তি আর সৈকত। এদের বয়স কল্পনা করে নিতে হবে। নাট্যকারের সঠিক জানা নেই। সমুদ্রের হাওয়ায় শুক্তির চুল উড়ছে। তার পরণে মেরুণ রঙের শাড়ি সম্ভবত সৈকত পছন্দ করে। ঢালু দিকটায় দাঁড়িয়ে সৈকত, একটু ওপরে শুক্তি। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। লাল সূর্যটা সারা গায়ে আবির মেখে অস্ত যাচ্ছে।]

সৈকত : সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলে শুক্তি
এই নিয়ে এলুম।
এখানে ক'দিনের জন্য নিশ্চিন্ত
কেউ চিনবে না আমাদের, আসবে না বিরক্ত করতে
আমরা নতুন মানুষ যেন
যত ইচ্ছা থাকো, ঘোরো, নিজেকে অনাবৃত করো
কেউ আসবে না শাসাতে তর্জনী তুলে।
[একটু থেমে]
কেমন পছন্দ হল ?

শুক্তি : [সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে]
এই তো সবে এলুম সৈকত
এখনি বলি কী করে পছন্দ হল কি না
প্রথম দেখায়, তুমি তো জানো, আমি ভুলি না।

সৈকত : ভালো, ভালো, বুদ্ধিমতীর মতো কথা
আমার বেলায় কিন্তু তা করো নি ;
আমি ভাগ্যবান বলতেই হবে।

শুক্তি : তোমাকে দেখেছিলুম আলাদা করে
ভীড়ের মধ্যে তুমি হারিয়ে যাওনি তাই।

মনে আছে সৈকত, খুব মনে আছে
দিল্লি যাবার সময় থ্রি'টিয়ারে—
তুমি ছিলে ওপরে
আর আমি ছিলুম নিচে।
শত শত মাইল গিয়ে কী একটা স্টেশনে যেন
তুমি প্রথম কথা পাড়লে।
বললে, আমার নাম সৈকত, দিল্লি যাচ্ছি বেড়াতে
যদি কোনো দরকার হয় বলবেন।
[শুক্তির কথা বলার ধরণে দুজনেই হেসে ওঠে]

সৈকত : তুমি বলেছিলে, মনে থাকবে—
মাপা, ছোট্ট কথা। বোঝাই যায়নি
আমার কথাটা তুমি নিলে কিনা
কী চাপা মেয়ে বাবা তুমি।
নামটুকু জানতে আমাকে কম কসরৎ করতে হয়নি
বলতে হয়েছিল, দিন না আপনার ঠিকানাটা লিখে
তাই জানতে পারলুম, তুমি শুক্তি রায় এবং

শুক্তি : এবং আবার কি ?

সৈকত : এবং নিজেই নিজের অভিভাবক।
[শুক্তি ম্লান হাসে। সৈকত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়]

শুক্তি : এখন আর তা নই সৈকত
আমি নিজের অভিভাবক হয়ে থাকতে চাইনে
পালাতেও চাই নি।
সমুদ্রে এলুম এই মহান নীলিমার কাছে
আত্মসমর্পণ করতে।
ওই নিরক্ত বিবর্ণ শহরে
কোনোদিন নিজেকে খুঁজে পাইনি।
তা ছাড়া এখানে তুমি আর আমি
দুজনে একা।
[দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে]

সৈকত : কৃতজ্ঞ হলুম কথা শুনে

সেজন্যেই তো তোমাকে বলি, অনুপমা।
সত্যি তোমার তুলনা নেই
তোমাকে যত দেখছি তত আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি।
[চিবুক নেড়ে]
আমার নিরুপমা
[সৈকত গুন গুন করে গান করে। শুক্তির ভাবান্তর]
শুক্তি : তোমার গান কি থামবে ?
সৈকত : [সকৌতুকে]
গান থামাবো কেন ?
এখানে গান করা বারণ নাকি ?
শুক্তি : না, সৈকত
তাছাড়া, তোমার ওপর জোর করব কেন ?
সৈকত : তোমাকে আমি পেয়েছি স্বপ্নের মতো করে
এই আকাশ, এই সমুদ্র সাক্ষী রেখে
সারা পৃথিবীর সামনে আমি চেঁচিয়ে
বলতে পারি, শুক্তি আমার স্বপ্নে-পাওয়া ধন।
কী, শুনতে রাজী ? চেঁচাব ?
শুক্তি : দোহাই তোমার, লোক জড়ো হবে
আমার কী ভয় জানো ?
সৈকত : কি ?
শুক্তি : তোমার এই সরল বিশ্বাসকেই আমার ভয় সৈকত
এত সহজে তুমি আমায় বিশ্বাস করো, তাই ভয় হয়।
তুমি কি আমার সব সবটুকু জানো ?
সৈকত : জানবার দরকার নেই আমার
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী
[হেসে ওঠে]
আমরা কেউ কাউকে সবটুকু জানতে পারি না
সারা জীবনেও না।
আমার মাকেই কি সবটুকু জানতাম ?
তিনি তো রক্ত দিয়ে দিনে দিনে আমায় গড়েছিলেন।

আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই
এক একটা অন্ধকার মহাদেশ
তার সূর্যহারা অরণ্যের অন্ধকারে সবাই ঢুকতে পারি না।
যতটুকু দেখা যায় তাকেই বলি আবিষ্কার
বলি, কী আশ্চর্য উপত্যকা !

শুক্তি : উচ্ছ্বসিত হয়োনা সৈকত
জীবন তো শুধু আলোকিত উপত্যকা নয়।
তার চড়াই উৎরাই, উঠানামা, খাদ অন্ধকার
সবটা নিয়েই জীবন।

সৈকত : এবং জীবন একটাই।

শুক্তি : তা জানি, কিন্তু

সৈকত : আর কিন্তু নয় শুক্তি।
তোমাকে যখন প্রথম দেখি
মনে হয়েছিল, আমার পাল-ছেঁড়া
নোঙর-তোলা নৌকো
বোধহয় তীর খুঁজে পেল।

শুক্তি : অমন কবিতা করে বলো না সৈকত।
জীবন কবিতা নয়,
তার রুক্ষ ব্যবহারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাই আমরা
কবিতার কোমলতায় তাকে ঘিরে রাখা
নিজেকেই প্রবঞ্চিত করা।

সৈকত : কবিতা নয়, জীবনের উপমা শুধুই জীবন।
আমাদের খোঁজা শুধু জীবনের চত্বরে চত্বরে
মিল খুঁজি তারই কিনারে।
আমি খুঁজছি তোমাকে, তুমি খুঁজে মরছো আমাকে
এইভাবে ঘূর্ণাবর্তে খুঁজে ফিরি আমরা জীবনকে।
জীবন শুধু কি বাঁচা ? নিঃশ্বাস
প্রশ্বাস শুধু টিঁকে থাকা ? আর কিছু নয় ?

শুক্তি : আরও কিছু আছে ?
কী তার নাম তা জানিনে।

হয়তো তারেই আমরা নাম দিই ভালবাসা
পরস্পরের কাছে শর্তহীন আত্মসমর্পণ।
কিন্তু আমি যে সবটুকু সমর্পণ করতে পারছি না
পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি,
বার বার প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছি
নিজেরই কাছে।

[সৈকত খানিকটা গম্ভীর হয়ে যায়। সমুদ্রের গর্জন। শুক্তির চুল হাওয়ায় উড়ছে। শুক্তি যেন এত কাছে এসেও নিজের চারদিকে আড়াল তৈরী করতে চাইছে।]

সৈকত : ওই দেখো সমুদ্র,
বার বার ফিরে আসছে
তটে আর তরঙ্গে চলে অন্তহীন সংলাপ।

শুক্তি : সৈকত, আমাকে তুমি ক্ষমা করো

সৈকত : ক্ষমা? কীসের জন্য ক্ষমা?

শুক্তি : আমি ফিরে যেতে চাই।

সৈকত : ফিরে যাবে?
তোমার জন্যেই আসা
তুমি বলেছিলে, সমুদ্র তোমার ভাল লাগে।

শুক্তি : ভুল বলেছিলুম সৈকত
আমায় সব ভাল লাগাই ভুল।
তোমার যত কাছে আসছি
আমার মন সংকোচে
মিশে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে,
আমি কী বলে তোমাকে বোঝাবো!
তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

সৈকত : যার বন্ধন নেই তার মুক্তি কে দেবে?
তুমি তো বন্দী নও
তুমি চেয়েছিলে নির্জনতা সমুদ্র বেলায়
এই তো সমুদ্র সামনে
এই ভাল লাগা তোমার মনের ইচ্ছা

ফিরে যাওয়া সেও স্বেচ্ছাধীন মনের বাসনা
আমি তোমার কাছে বন্ধন হব না কোনদিন।

[শুক্তি খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। চুলগুলো দিয়ে আলতো খোঁপা বাঁধার চেষ্টা করে। হাওয়ায় বার বার চুল খুলে যায়। সন্ধ্যার আকাশের তলায় ওকে দেখায় যেন এক বিষণ্ণ প্রতিমা]

শুক্তি : এর চেয়ে বন্ধন ছিল ভাল
মুক্ত বলেই আমি এমন নির্মম হতে প্যারছি সৈকত
তোমাকে দেবো বলেও সবটুকু দিতে পারছি না
মুক্তি তো আমি চাইনি
বন্ধনে আবদ্ধ হলে এর চেয়ে শান্তি পেতুম।

সৈকত : ভালবাসা বন্ধনও নয়, মুক্তিও নয়
দুয়ের সমাহার
এভাবেই ভালবাসা বিকশিত হয় আপন খেয়ালে।

শুক্তি : ওতেই আমার আপত্তি
তুমি কেন জোর করে বলতে পারো না—
না তোমার যাওয়া হবে না,
তুমি আমার সম্পূর্ণ
তোমাকে এখানেই থাকতে হবে যতদিন আমার খুশী ?

[সৈকত বালুতে হাত ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে ঘর গড়ে, ঘর ভাঙ্গে। সমুদ্রের উত্তাল গর্জন শোনা যায় বাতাসে। ঝাউবন দূরে হা হা করে ফেরে]

সৈকত : বলতে পারতুম শুক্তি,
যদি আগেকার সৈকতটাকে পেতুম হাতের কাছে
যে আমার স্বপ্নে আমার পোষাক পরে
যুবকের মতো উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে হাওয়ার আগে।
সে এখন নিরুদ্দেশ,
এখনকার সৈকত একটা পোষ-মানা পাখি।

[একটু থেমে]

আমার কী মনে হয় জানো ?

শুক্তি : বলো, কী মনে হয় তোমার ?
আমি তোমার কাছে শুনবো বলে এসেছিলুম, সৈকত
তুমি আমাকে কথা বলতে দিচ্ছো কেন ?
কেন তুমি কথায় কথায় আমার সব কথা
ডুবিয়ে দিতে পারছো না ?
কেন তুমি প্রার্থীর মতো
আমার কাছে হাত পেতে আছো ?
কেন তুমি বলতে পারছো না :
শুক্তি, তুমি আমার, তুমি আমার, তুমি আমার
কেন তুমি বলতে পারছো না সৈকত ?
কেন ? কেন ? কেন ?

[বলতে বলতে শুক্তি মুখে আঁচল দিয়ে কেঁদে ওঠে। সৈকত ওকে কাছে টেনে নেয়। মাথায় হাত বোলায়। তারপর বসিয়ে দেয় বালুর ওপর। অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। কেউ কোনো কথা বলছে না।]

সৈকত : কীসের সংকোচ তোমার ?
কেন এত ভয় বাসা বেঁধে আছে মনে ?

শুক্তি : ভয় আমার মনের
তোমার প্রার্থীর মতো মুখ দেখলে
আমার আর একটি মুখের কথা মনে পড়ে
আরেকটি মুখ
তার নাম অরুণ।

[আলো স্তিমিত হয়ে শুক্তি অতীতে ফিরে যাবে। অতীতের একটি দৃশ্য অভিনীত হবে। মঞ্চের একপাশে আলোর বৃত্তে এসে অরুণ দাঁড়াবে। তার সঙ্গে আসবে শুক্তি। শুক্তির পোষাক হবে কলেজ-যাওয়া মেয়ের মতো। অরুণের চোখে চশমা। হাতে বইপত্তর।]

অরুণ : কিছু বলো, কিছু শুনি।

শুক্তি : তুমি বলো।

অরুণ : কী বলবো ? আজ আবহাওয়ার আগামী
চব্বিশ ঘণ্টার পূর্বাভাষে বলা হয়েছে,
বঙ্গোপসাগর থেকে বায়ুর নিম্নচাপ···

[দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।]

শুক্তি : যাও

অরুণ : তার মানে এসো।

শুক্তি : অরুণ, সত্যি করে বলো
তুমি আমায় ভালোবাস ?

অরুণ : কী দিব্যি দিতে হবে বলো ?
তোমার দিব্যি ?

শুক্তি : না না, আমার দিব্যি নয়
আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমি কী করব ?

অরুণ : কী আবার করবে ?
অপেক্ষা করবে, আমাদের পড়া শেষ হলে
একদিন এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

শুক্তি : বাঃ রে এতোই সোজা
মা রয়েছেন মাথার ওপর।

অরুণ : হ্যাঁ, মায়ের কাছে গিয়ে বলবো :
আমাকে কী কী বীরত্বের প্রমাণ দিলে
আপনার কন্যার পাণি সমর্পণ করবেন বলুন।

[দুজনেই হেসে। সরল নিষ্পাপ হাসি]

শুক্তি : আমার ভয় করছে অরুণ
আমার কেবলি মনে হচ্ছে, তোমাকে
শুধু শুধু প্রতারণা করছি।

অরুণ : প্রথম প্রেমে এমন ভয় সবারই করে।

শুক্তি : অভিজ্ঞতা আছে নাকি ?
তোমার সঙ্গে তাহলে আড়ি।

অরুণ : অমনি অভিমান
অভিজ্ঞতা আমার নয়, আমার পিতৃপুরুষের
অনাদি কালের প্রেমে আমরা বাঁধা পড়ে আছি

তুমি, আমি, আমাদের পিতৃপিতামহ সব
ভালবাসার একই ধরন, একই সংলাপ
যুগে যুগে উচ্চারিত হতে থাকে।

শুক্তি : আমি অতশত বুঝিনে অরুণ
তুমি কবে আসবে তার জন্য আমি প্রতীক্ষা করব
যেদিন বলবে, সেদিন যাবার জন্য প্রস্তুত থাকব।

অরুণ : তাই কথা রইল
এই নাও অভিজ্ঞান।

[একগুচ্ছ ফুল দেয়। তারপর অরুণ চলে যায়। আলো প্রস্ফুটিত হয় আবার দেখা যাবে সমুদ্র। সৈকতে বসে আছে শুক্তি আর সৈকত]

শুক্তি : সেই স্বপ্ন একদিন ভেঙে গেল
চরম নির্মমতায়।
যেদিন সময় এল বাধা দিলেন মা।
অরুণের মা মুখে রক্ত উঠে মারা গিয়েছিলেন
ভয় ছিল মা'র
হয়তো অরুণেরও রক্তে আছে রোগ।
এই প্রত্যাখান সে সহ্য করতে পারল না
আমারও সাহস ছিল না, মা'র মনে কষ্ট দিই
পিতৃহারা কন্যাকে তিনিই বড় দুঃখে
মানুষ করেছিলেন।
আমি পারলুম না, অরুণকে কথা দিতে।

সৈকত : তারপর ?

শুক্তি : তারপর একদিন সব শেষ
অরুণ আত্মহত্যা করল
তার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী

[বলতে বলতে শুক্তি অাঁচলে মুখ গোঁজে। সমুদ্রের গর্জনকে করুণ কান্না বলে মনে হয়।]

এ কথা আমি ভুলতে পারছি না।
যে-ভয়ে আমার মন এখনো আচ্ছন্ন

সেই-ভয়ে বাধা দিল কিশোরী শুক্তিকে।
আমি সেই থেকে শুধু তার ছায়া দেখি
থাকি অন্ধকারে, অরুণের বিষণ্ণ মুখের ছায়া
আমাকে আচ্ছন্ন করে বারবার
আমি ঘুমোতে পারি না।
আমি ওকে কিছুই দিতে পারিনি
দিতে পারতুম এই আশায়
সে প্রাণ দিয়ে গেল
রেখে গেল চিরকালের অপরাধী করে।
আমার মুক্তি নেই, সৈকত
যখন তোমাকে পেলুম,
মনে করলুম নতুন করে বাঁচবো
তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করে।
তুমি দিলে শুধু অধিকার
আমি চাই সমর্পিত হতে।

[সৈকত পায়চারী করতে থাকে। কী বলবে সে বুঝতে পারে না। শুক্তিকে সে ভালোবাসে। শুক্তিও সৈকতকে পেয়ে ভেবেছিল সে বুঝি বেঁচে গেল ভালবাসার জোরে। কিন্তু মনের অন্ধকার এসে মাঝখানে প্রাচীর টেনে দিতে লাগল। সৈকত যত ঘনিষ্ট হতে চায় শুক্তি তত পিছিয়ে যায়।]

সৈকত : তুমি অরুণকে ভুলতে পারছ না শুক্তি
অরুণ মরে গিয়ে চিরকালের হয়ে রইল তোমার
আমি শুধু বিকল্প প্রতীক।

শুক্তি : সৈকত, দোহাই তোমার,
এমন স্পষ্ট করে বলো না।
আমি জানি, এভাবেই বলতে চাইবে তুমি
সবাই তাই বলবে।
আমি বলি না তা, আমার মনের ভেতরের অন্ধকার
বার বার ছায়া ফেলে যায়

আমি একজনের মৃত্যুর কারণ হয়েছি
এ আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না
সারা জীবনেও না।

সৈকত : সে-অন্ধকার দূর করতে পারে
একমাত্র ভালোবাসার আলোক
যা দিয়ে আমরা পরস্পর আলোকিত হতে পারি।
তোমার ঠিক ভালোবাসার জায়গাটি
আমি ছুঁতে পারিনি বলেই
তুমি কল্পিত অন্ধকারে ভীত হয়ে আছো
এ আমারই অযোগ্যতা।

শুক্তি : তুমি বারবার আমাকে অপরাধী করো
আমাকে ঐশ্বর্যের আড়ালে বন্দী করে দাও বলেই
আমি তোমার কাছে ধরা দিতে পারছি না।

সৈকত : সহজ মনে সব অন্ধকার
ধুয়ে মুছে ফেলে দাও
নিষ্পাপ কিশোরীর মতো উঠে এসো।
আকাশে রক্তাক্ত সন্ধ্যা,
একটু পরেই উঠবে চাঁদ
সামনে অন্তহীন নীলিমায় অলঙ্কৃত সমুদ্র
এই তো জাগবার সময়
তুমি জাগো, কথা বলো, হাত ধরো।

[সৈকত হাত বাড়িয়ে মায়াবী নায়কের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আকাশে বাতাসে উৎসবের আয়োজন! শুক্তি দ্বিধা করে। এগিয়ে যায়। আবার পিছিয়ে অন্যদিকে তাকায়।]

শুক্তি : না না না, আমায় ক্ষমা কর সৈকত
যখন এখানে পা দিলুম
মনটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।
মনে হয়েছিল, ওই বুঝি প্রতীক্ষার শেষ
তুমি একটি পুরুষ, সুন্দর, সহৃদয়

আমি উন্মুখ একটি নারী।
ভেবেছিলুম, এই তো সমর্পণের সময়
কিন্তু—

সৈকত : আর কিন্তু নয়,
তুমি এক অনন্ত রহস্যময়ী নারীর মতো
অইখানে অনাদিকাল দাঁড়িয়ে থাকো
তাহলেই আমি সুখী হব ?
আমি যদি যুবক সৈকতটাকে কোনো এক যাদুমন্ত্র বলে
এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে পারি
মায়ের মুখে শোনা সেই দস্যিপনা
আবার জাগিয়ে তুলতে পারি
তাহলে কি তোমাকে সেই অন্ধকার থেকে
ছিনিয়ে আনতে পারি না ?
এ তো সব পুরুষেরই স্বধর্ম,
এতে আর বীরত্বের কী আছে ?
কিন্তু না, আমি তা করব না
তুমি তাকাও আমার চোখের দিকে
তাকাও শুক্তি।

শুক্তি : তোমার দিকে তাকালে স্মৃতি আমাকে
আগুনের শলাকায় বিদ্ধ করে।
আমি তাকাতে পারছি না সৈকত
আমি তোমার চোখে আরেকজনের চোখ দেখতে পাই
সে চোখে অনন্ত মিনতি
সে চোখে অতৃপ্ত তৃষ্ণার জ্বলন্ত আগুন।
না, না, না, আমি পারব না সৈকত
আমি তোমার কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকব
আমাকে তুমি মুক্তি দাও
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও।

সৈকত : এখানে আসবার আগে কী বলেছিলে
মনে আছে ?

শান্তি ঃ আর মনে করিও না সৈকত

সৈকত ঃ বলেছিলে, চলো পালিয়ে গিয়ে
আমরা বাঁচি সৈকত।
এই জীবনের বদ্ধজলা থেকে
ভালবাসার উৎক্ষিপ্ত উচ্ছল তরঙ্গে ঝাঁপ দিই।

শান্তি ঃ [সৈকতের মুখ চাপা দিয়ে]
না, না, না, আমাকে কিছু মনে করিয়ে দিও না
অন্ধকারের ছায়া আমাকে আবৃত করল
আমি ওই গানের মানুষ হয়ে থাকতে চাইনে
আমি সহজ হতে চাই।

[সৈকত শান্তির দুহাত ধরে কাছে আকর্ষণ করে]

সৈকত ঃ সহজ তো আমরা দুজনেই
কারু কাছে লুকোবার নেই কিছু।
এই সমুদ্রের মতো, আকাশের মতো
অবারিত, অনাবৃত।
যেদিন প্রথম তোমায় দেখেছিলুম
সেদিন থেকেই চেয়েছি সহজ হতে
বলো তুমি, সত্যি বলছি কিনা।

শান্তি ঃ সহজ হওয়া যায় না অত সহজে
সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে।

[দুজনেই হেসে ওঠে। খানিকক্ষণ স্তব্ধতা।]

সৈকত ঃ শান্তি!

শান্তি ঃ সৈকত, তুমি হঠাৎ করে এমন ডেকে ওঠো
আমি চমকে উঠি।

সৈকত ঃ চমকাবার কিছু নেই
এই সমুদ্রতীরে অজস্র নীলিমার তলে
আজকের এই সন্ধ্যা আশ্চর্য তন্ময়তায় আচ্ছন্ন।
এখানে সব যেন নিজের কাছে
নিজে ধরা দিতে বসে আছে।
তাই তো এখানে তোমাকে নিয়ে এলুম

তোমাকে একান্ত করে কাছে পাব বলে
তুমি তো জানো আমি ছন্নছাড়া, বাউণ্ডুলে
আমার আর কোনো বন্ধন নেই
শুধু······

[শুক্তি ওর কথায় বাধা দেয়]

শুক্তি : উচ্চারণ করো না বাকীটুকু
আমার ভয় করে।
তোমাকে আমি বাঁধতে চাইনি সৈকত
বাঁধবো এমন ঐশ্বর্যও আর অবশিষ্ট নেই
আমি জানি আমার দেবার মতো নেই কিছু।
আমি হলুম চৈত্র দিনের চাতক
জল দিতে জানি না, শুধু চাইতে জানি
আমি যে ভীষণ তৃষ্ণার্ত সারাজীবন, সৈকত।

সৈকত : বার বার তুমি ওই কথা বলো না
আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়।
আমাকে তুমি ডেকেছো বলেই না
এমন করে ফিরে পেতে চাইছি নিজেকে।
আমরা কি সব সময় নিজেকে জানতে পারি?
আমরা একে অপরের দর্পণে নিজেকে দেখি।
কী ছিল আমার?
যা হতে চেয়েছিলুম তা হতে পারি নি।
জানো শুক্তি, আমি ঘুমের মধ্যে
সৈকত সৈকত বলে কতদিন চেঁচিয়ে উঠি
আমি দেখি, আমার পোষাক পরে
আমার চেয়ে যুবক একটি লোক
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এগিয়ে যাচ্ছে
আমি ডাকি সৈ-ক-ত, সৈ-ক-ত,
কোথায় যাচ্ছ তুমি?
সে ফিরে তাকায় না শুধু ছুটে চলে
অথচ আমি স্পষ্ট দেখতে পাই,

ও একটুও এগুতে পারছে না
ঘুরপাক খাচ্ছে একটি কামুক্লাজ বৃত্তের মধ্যে।
ঘুম ভেঙে যায়,
দেখি সারা গা আমার ভিজে গেছে।

শুক্তি : সে জন্যেই তো আমার ভয়
আমি জানি,
আমি কিছু দিতে পারব না তোমায়।

সৈকত : আমি যে প্রার্থী হয়ে এসেছি তোমার কাছে।
ছোটোবেলায় মা বলতেন, 'তুই একটা দস্যি
জ্বালাতন করে মারিস্ আমাকে'
কিছুতেই বাগ মানানো যেত না আমায়
বাবা রেগে গেলে বেত মারতেন পিঠে
এখনো বোধ হয় তার দাগ আছে।

শুক্তি : এখন তোমাকে দেখে তা মনেই হয় না।
তুমি কতো শান্ত!
তুমি জোর করতে জানোই না!

সৈকত : এ হল ছোটবেলার উচিত-শিক্ষার ফল।
সহজে কি ভোলা যায়!

[দুজনেই হেসে ওঠে। পরক্ষণেই শুক্তির বিষণ্ণতা।]

শুক্তি : আমি শুক্তিকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

সৈকত : শুক্তি!

শুক্তি : আমি যাই।

সৈকত : কোথায়?

শুক্তি : কলকাতায়, রাতের ট্রেনে।

সৈকত : তুমি পাগল হয়েছো শুক্তি
তুমি কী করতে যাচ্ছো বুঝতে পারছো না?
আমাদের এতদিনের প্রতীক্ষা
তোমার কল্পিত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতে চলেছে।

শুক্তি : জানি না, জানি না, জানি না
আমাকে যেতে দাও।

সৈকত ঃ চলো ঘরে চলো
পরে দেখা যাবে ।

[ওরা বেরিয়ে যায় । আস্তে আস্তে মঞ্চ অন্ধকার হয় । তখন সমুদ্র গর্জন করে চলেছে । আকাশে চাঁদ উঠেছে । মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যাবে শুক্তি ঘরের ভেতরে । সৈকত ঘরের বাইরে । জানালা দিয়ে শুক্তিকে দেখা যাচ্ছে !]

সৈকত ঃ দরজা খোলো শুক্তি
সারা রাত এ ভাবে বাইরে বসে থাকব ?

শুক্তি ঃ আমাকে একা থাকতে দাও ।

সৈকত ঃ পাগলামি করো না শুক্তি ।

শুক্তি ঃ আমাকে ক্ষমা করো সৈকত
আমি ভেবেছিলুম তোমাকে সব দিতে পারব ।
সব দেবো বলেই এসেছিলুম
এখানে কোনো বন্ধন নেই, মুক্ত, অবারিত
আকাশ, সমুদ্র, নীলিমার সমস্ত বিস্তার
এখানেই হৃদয় মেলে দেবার উপযুক্ত জায়গা ।

সৈকত ঃ তবে দ্বিধা কেন ?

শুক্তি ঃ দ্বিধা আমার মনে
সেখানে এক সুগভীর অন্ধকার ।
সেই অন্ধকারে আরেকজনের মুখ দেখতে পাচ্ছি
তার চোখে অসীম মিনতি
সে আমার ভালবাসার মালা বুকে নিয়ে
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে
অলৌকিক ঝর্নার জল তার শরীর ধুয়ে দিচ্ছে
বৃক্ষলতা ডালপালার কাফন গায়ে দিয়ে
সে এখন অনন্ত শয্যায় শায়িত
আমি তার কাছ থেকে সরে আসতে পারছি না ।

সৈকত ঃ শুক্তি, তুমি স্থির হও
তুমি এক অসম্ভব স্মৃতির পিছনে ঘুরছো

তুমি বলেছিলে, সৈকত আমাকে তুমি উদ্ধার করো।
আমি তোমাকে নিজের মতো করে জাগাতে চেয়েছিলুম
তুমি কথা দিয়েছিলে, আমার কাছে আসবে
এখন তুমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছো কেন?

শুক্তি : আমি পারছিনা সৈকত
আমার বুকে অসীম বেদনা, স্মৃতির আগুনে
আমি জ্বলে পুড়ে মরছি
তোমাকে আমি কোনদিন ভালোবাসিনি
আমি তোমাকে সামনে রেখে অরুণকে ভুলতে চেয়েছিলুম
আমি ওকে ভুলতে পারিনি।

সৈকত : তুমি দরজা খোলো শুক্তি
তুমি এক অসম্ভব অস্থিরতায় আক্রান্ত
তুমি কী বলছো তুমি নিজেই জানো না।

শুক্তি : আমি কী বলছি তা আমি জানি
আমাকে তুমি মুক্তি দাও সৈকত
এই যন্ত্রণা থেকে, এই নিঃসঙ্গতা থেকে
এই অন্ধকার থেকে
আমি মুক্তি চাই, আমি মুক্তি চাই।

সৈকত : আমি যদি দরজা ভাঙি?

শুক্তি : মস্ত ভুল করবে তাহলে।

সৈকত : ভুল করছো তুমি
তোমাকে এই স্মৃতির আগুন থেকে বাঁচাবো।

শুক্তি : পারবেনা সৈকত, তা আর হয় না
আমি অন্ধকারের মুখোমুখি একা।
আমার ভালবাসার পুরুষ নও তুমি
তুমি তার প্রতীক।
প্রতীক কখনো প্রার্থিত হতে পারে না।
যখন তোমাকে সবটুকু দিয়ে
আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত ছিলুম
তখন তুমি নিজের মহিমায়
আমাকে শুধু স্তুতি করেছো
ভালবাসতে পারোনি।
আজ আমি তোমার কাছে মুক্তি চাই
তুমি ভালবাসা চাও ভালবাসতে পারো না
আমি তোমার কাছে চেয়েছিলুম ভালবাসা
অধিকারে নয়, আত্মসমর্পণে
তুমি তা দিতে পারোনি।

সৈকত : অসম্ভব কথা বলছো তুমি
যে শুক্তিকে আমি জানি তার সঙ্গে

আজকের এই মুহূর্তের শুক্তির কোনো মিল নেই
তুমি এই মাতাল জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে গেছো।

শুক্তি : [অসংলগ্ন হাসি হেসে]
মাতাল হইনি আমি
স্মৃতি আমাকে মাতাল করছে সৈকত
তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

সৈকত : মুক্তি. মুক্তি, মুক্তি,
তোমাকে আমি মুক্তি দেবো বলেই
কাছে পেতে চাই।

[সৈকত প্রবলভাবে দরজা ধাক্কায়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে যায়। ভেতর থেকে আর্ত চীৎকার।]

শুক্তি : সৈকত, তুমি বড় দেরি করে এলে
আমি বাঁচতে চেয়েছিলুম সৈকত
আমি তোমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলুম অরুণকে
সেই অসম্ভব ভালবাসার আনন্দ
আমি সইতে পারলুম না সৈকত
তুমি বড় দেরি করে এলে।

[সৈকত ঘরে ঢুকে শুক্তিকে কোলে তুলে নেয়। বিষ খেয়ে শুক্তি তখন মৃত্যুপথযাত্রী। দূরে সমুদ্র গর্জন। সৈকত শুক্তিকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে কেঁদে ওঠে। শুক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।]

সৈকত : শুক্তি, তুমি একি ভীষণ খেলা
খেললে আমার সঙ্গে!
শুক্তি, বলে যাও
তুমি আমার ভালবাসা নিয়েছিলে।
বলে যাও, আমার ভালবাসাকে
তুমি অবিশ্বাস করোনি।
বলে যাও, আমি তোমাকে
ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখতে চেয়েছিলুম
বলো, বলো, কথা বলো শুক্তি।

[সৈকতের অশ্রুধারায় পর্দা নামে]

প ট ক্ষে প

অন্ধকারে যুঁই ফুলের গন্ধ

মিঠু-কে

চরিত্র লিপি

সমাদ্দার শশীমামা

পথিক অনির্বাণ

মালা

অন্ধকারে যুঁই ফুলের গন্ধ

[শহরের এককোণে একটি হোটেল বাড়ি। আদর্শ ভোজনালয়। আর একটি ঘরে হোটেল মালিক শশী মান্না হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দুজন অতিথি নিয়ে প্রবেশ করল। একজন সেলস্‌ম্যান সমাদ্দার ; হাতে অ্যাটাচি ও সুটকেশ। অন্যজন পথিক রায়, যুবক, ইন্টারভিয়্যু দিতে এসেছে। কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ। ঘরে একটা মাত্র তক্তাপোষ, একটা ভাঙা আয়না, দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে মেয়ের মুখ, জলের কুজো ইত্যাদি।]

সমাদ্দার : কী নাম বললেন ?

মান্না : কার নাম ? আমার নাম শশী মান্না।
হোটেলের নাম আদর্শ ভোজনালয়
নামটা পছন্দ হল স্যার ?

সমাদ্দার : পছন্দ ? খুব পছন্দ।
এই ঘরেই তাহলে থাকতে দিলেন ?

পথিক : বেশ সুন্দর ঘর, নির্জন, চৌকো
মন্দ কি ?

মান্না : আপনি যা বলেন স্যার।

পথিক : আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। ওঁকে।

সমাদ্দার : এই ঘরে দুজন থাকব কী করে ?

মান্না : আর তো ঘর নেই। সব ভর্তি। একটি ঘরই খালি ছিল।
আপনারা এলেন অসময়ে, রাত্রিবেলা।
আর কোনো ঘর নেই দিব্যি বলছি।

পথিক : দক্ষিণ ? দক্ষিণ দিক কোনটা ?

সমাদ্দার : সে জেনে আর কি হবে ?

পথিক : উত্তর দিকটা বললেও হবে।

মান্না ঃ উত্তর ? [আপনমনে] সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে
পূর্ব দিক জানা যায়। পিছনের দিকটা পশ্চিম,
ডান হাতের দিকটা······
সমাদ্দার ঃ ভূগোল শেখাচ্ছেন ?
মান্না ঃ মাপ করবেন স্যার। তাহলে এই ঘরে বিশ্রাম করুন।
রাত্রে খাওয়া দাওয়া ?
সমাদ্দার ঃ খিদে নেই।
পথিক ঃ কী পাওয়া যায় ?
মান্না ঃ এমনিতে অনেক কিছুই পাওয়া যায়।
আজ আবার বাজার বসেনি বর্ষায়। আলু পোস্ত······
পথিক ঃ ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্। আর বলতে হবে না বুঝেছি।
মান্না ঃ আমার দোষ নেই স্যার। বাজার বসেনি বর্ষায়।
আলু পোস্ত······
সমাদ্দার ঃ কী নাম বললেন ? আদর্শ ভোজন—
মান্না ঃ —আলয়
পথিক ঃ সন্ধি করে ভোজনালয়, তাই তো—
মান্না ঃ নিবারণ পণ্ডিত নামকরণ করেছেন স্যার। ইস্কুলের মাস্টার।
আমি নিস্তারিণীর নামে রাখতে চেয়েছিলুম
বারণ করলে।
সমাদ্দার ঃ নিস্তারিণী ?
মান্না ঃ [সলজ্জ ভঙ্গিতে] সপ্তে ঘণ্টের গব্বোধারিণী স্যার।
আমার ঘরের লক্ষ্মী।
বিয়ের পর থেকেই ব্যবসাটা যা হক জমে উঠল।
পথিক ঃ জমে উঠল ?
মান্না ঃ আপনাদের পাঁচজনের দয়ায়।
সমাদ্দার ঃ কীভাবে জমালেন ?
মান্না ঃ পাঁচজনকে খাইয়ে দাইয়ে।
পথিক ঃ কী খাবার আজ পাওয়া যাবে বললেন ?
মান্না ঃ আলু পোস্ত।
পথিক ঃ আলু পোস্ত ? ব্যাস্······

মান্না : বাজার বসেনি বর্ষায়।
সমাদ্দার : আর ঘর ছিল না, এই ঘরে দুজন ?
মান্না : পূর্ব দক্ষিণ বন্ধ। নির্জন। ঝামেলা নেই।
পথিক : ঝামেলা ? কীসের ঝামেলা ?
মান্না : বাইরের।
সমাদ্দার : বাইরের ঝামেলাও আছে না কি ?
পথিক : আপনি চমকে উঠলেন।
সমাদ্দার : চমকাবো না ? দিনকাল খারাপ।
মান্না : খুব খারাপ।
সমাদ্দার : খুব খারাপ ? কী রকম খারাপ ? চোর ডাকাত গুণ্ডা ?
মান্না : কিছু বলা যায় না।
সমাদ্দার : কিছু বলা যায় না ? আপনি বললেন, বাড়ির মতো থাকবেন।
মান্না : বাড়িতে কি ঝামেলা নেই ?
পথিক : থাকতে পারে। থাকা স্বাভাবিক।
সমাদ্দার : থাকা স্বাভাবিক ? আপনিও ওর কথায় সায় দিলেন।
মান্না : লুকিয়ে ছাপিয়ে কারবার করি না স্যার।
পষ্টাপষ্টি সব বলে নিই। সেদিন…
সমাদ্দার : সেদিন কি ? থামলেন কেন ?
মান্না : নাথাক্। নিরালায় থাকবেন। পূর্ব দক্ষিণবন্ধ, উত্তর পশ্চিম খোলা।
ওপাশে তেওয়ারির খাটালটাই যা নুইসেন্স—
[বাইরে হিন্দুস্থানী গানের রেশ]
শুনতে পাচ্ছেন ?
পথিক : চমৎকার। রাতটা কাটবে ভালো।
মান্না : বাদলার রাত। ঘুম হবে।
সমাদ্দার : মশা ? আরশোলা ?
মান্না : রোজ ফ্লিট দেবার ব্যবস্থা আছে স্যার।
বাজারে স্টক নেই তাই ক'দিন পাওয়া যায় নি।
সমাদ্দার : লোক ঠকাচ্ছেন।
মান্না : আমার দোষ নেই সমাদ্দার বাবু।
বাজারে স্টক নেই।

সমাদ্দার : একঘরে দুজন।
পথিক : চলে যাবে কোনরকমে।
সমাদ্দার : আমার চলবে না। একটা মাত্র খাট।
পথিক : আমি মেঝেতে শোব।
সমাদ্দার : মশা, আরশোলা।
মান্না : কোথায় নেই স্যার? বাড়িতেও।
সমাদ্দার : আপনি চুপ করুন।
মান্না : এই চুপ করছি।
[মোমবাতিটা টেবিলের ওপর বসাতে গিয়ে নিবে যায়]
এই যাঃ
[অন্ধকার : নীরবতা]
সমাদ্দার : মিঃ মান্না, শশী মান্না।
মান্না : এই যে স্যার, আপনার ডান দিকে।
সমাদ্দার : আমি আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না।
মান্না : আমার গলার স্বরেই বুঝতে পারবেন।
পথিক : অন্ধকার···প্রভুর বড় দয়া। আমরা অন্ধকারে থাকি।
অন্ধকার···সর্বত্র অন্ধকার।
মান্না : দেশলাই? আপনাদের কাছে দেশলাই আছে?
সমাদ্দার : সিগারেট খাই না।
মান্না : টর্চ?
সমাদ্দার : আপনার কাছেই থাকবার কথা।
আপনি হোটেলের মালিক।
আমাদের কাছে টর্চ চাইছেন?
পথিক : অন্ধকার···সর্বত্র অন্ধকার···প্রভুর বড় দয়া।
সমাদ্দার : আপনার কবিতা আসছে?
পথিক : বড় নিরালা, বড় এলাকা।
একটু পরে কি চাঁদ উঠবে?
মান্না : তিথি মনে নেই স্যার।
সমাদ্দার : আপনি ঠগ। আমাদের ঠকিয়েছেন।
মান্না : এই যে পেয়েছি স্যার···পকেটেই ছিল।

[দেশলাই কাঠি জেলে মোমবাতি ধরায়]

সমাদ্দার : এই মোমবাতি সম্বল।

মান্না : বিজলি ছিল, কানেকশান নেই। থেকেও লাভ হত না, যখন তখন লোডশেডিং

সমাদ্দার : খরচ বাঁচাচ্ছেন ?

মান্না : আমার দোষ নেই স্যার। সর্বত্র এক অবস্থা।
মোমবাতি তার চেয়ে বিশ্বস্ত।
দেশলাই থাকলেই জ্বালানো যায়।

পথিক : অন্ধকার ভালো। একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

মান্না : পূর্ব দক্ষিণ বন্ধ, উত্তরের জানলা দিয়ে হয়তো দেখা যাবে

সমাদ্দার : আজ কি তিথি ?

মান্না : তিথি মনে নেই। পাঁজিটা হৃদয় সরকার নিয়ে গেছে।
বাড়িতে অন্নপ্রাশন।

সমাদ্দার : One more mouth to feed.

পথিক : আনিলাম অপরিচিতের নাম ধরণীতে।
নবজাতকের জন্যেই তো পৃথিবী।

সমাদ্দার : এদেশের কিছু হবার জো নেই।
পিল্ পিল্ করে লোক বাড়ছে।

মান্না : আমার মাত্র দুটি ছেলেপুলে।

সমাদ্দার : বয়স ?

মান্না : এই মাঘে পঁয়ত্রিশ।

সমাদ্দার : আপনার নয়, ছেলেপিলের।

মান্না : একটার সাত, ছোটটার পাঁচ।

পথিক : উঃ কী গুমোট ! চাঁদ উঠবে কখন ?

মান্না : পূর্ব দক্ষিণে দেখার জো নেই,
উত্তরের জানলা দিয়ে দেখা যাবে।

সমাদ্দার : তখন থেকে এক কথা… ড্যাম ইওর চাঁদ।

পথিক : আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন মিঃ সমাদ্দার।

মান্না : আমি তাহলে আসি।

সমাদ্দার : আমাদের এই ঘরে আটকে ?

মান্না : দরজার হুড়কো নেই। চেয়ারটা দিয়ে ভেজিয়ে দেবেন।

সমাদ্দার : হুড়কো নেই ?

মান্না : ছিল। গত বিস্যুদবারে ভেঙে গেছে।

পথিক : হাওয়া আসবে, মন্দ নয়।

সমাদ্দার : মান্না, আপনি একটা আস্ত ঠগ।

মান্না : আমি ভাঙিনি। মালদা থেকে বোর্ডার এসেছিল
নিজেরা মারামারি করে ভেঙে ফেলেছে।

সমাদ্দার : মারামারি ? হোটেলে ?

মান্না : প্রায়ই হয়।

সমাদ্দার : প্রায়ই হয় !
আপনি বললেন এমন শান্তির জায়গা শহরেপাবেন না ?

মান্না : শান্তিতে থাকলে শান্ত। বাইরের ঝামেলা······

সমাদ্দার : বাইরের ঝামেলা ?

মান্না : হতে কতক্ষণ ? আমি যাই স্যার। আবার ইচ্ছা হলে ডাকবেন।
কলিং বেল ছিল। বিজলি নেই।
হাততালি দিয়ে ডাকবেন মান্না বলে। তাহলে যাই স্যার।
আপনারা বিশ্রাম করুন।

[মান্না চলে গেল। সমাদ্দার খাটের ওপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। পথিক চেয়ারে। মোমবাতি জ্বলছে। নীরবতা।]

সমাদ্দার : শশী মান্না আস্ত ঠগ।

পথিক : লোকটা বেশ সরল।

সমাদ্দার : সরল ! একটা ঘুঘু। এই ঘরে কী করে কাটানো যাবে ?

পথিক : কোনোরকমে কেটে যাবে একটা তো রাত।

সমাদ্দার : না, আমাকে থাকতেও হতে পারে। আমি সেলস্‌ম্যান,
কাজ পড়লে থাকতে হতে পারে আরও ক'দিন।

পথিক : আমি কালই চলে যাব। বড় জোর পরশু সকাল।

সমাদ্দার : কীসের জন্যে এসেছেন ? চাকরি ?

পথিক : চাকরির চেষ্টায়।

সমাদ্দার : ছ'বছর বেকার ছিলুম। তারপর সেলস্‌ম্যানের কাজ নিয়েছি।

পথিক : এখন ভাল আছেন ?

সমাদ্দার : ভাল থাকা আপনি কাকে বলেন পথিকবাবু ?

পথিক : এই চলে যাওয়া । ঠিক বোঝাতে পারবো না।
কোনো দিন ভাল থাকার সুযোগ পাইনি তো ।
কী করে বলবো ?

সমাদ্দার : বাঁচার ধান্দায় জিভ বেরিয়ে গেল ।
সারা রাজ্যি টো টো করে বেড়ানো ।
আজ এখানে কাল দুশো মাইল দূরে ।
আজ শহরে কাল গাঁয়ে । আজ পাহাড়ে কাল সাগরে ।
রোজ দৃশ্যপট পাল্টে যায় ।
মানুষের মুখ বদল হয়ে যায় ।
কী করে বলবো ভাল আছি ।

পথিক : ভালো থাকতে দিচ্ছে কে ? অনেক কিছু স্বপ্ন ছিল মানুষের ।
সে সব কোথায় চলে গেল ।

সমাদ্দার : স্বপ্ন ? You mean dream. হা হা ।
স্বপ্ন দেখেন নাকি আপনি ?

পথিক : তেমন আর কই দেখি ।

সমাদ্দার : স্বপ্ন-টপ্ন সব বাজে কথা । শশী মান্না কি স্বপ্ন দেখে ভেবেছেন ?

পথিক : দেখলে হোটেলের চেহারা অন্যরকম হত ।

সমাদ্দার : দেখুন এই সব স্বপ্ন একদিন আমিও দেখতুম ।
নতুন জীবন, নতুন আশা, কত কি করব ? হা হা ।
কোথায় গেল সে সব ?

পথিক : [অন্যমনস্কভাবে] এক্ষুনি চাঁদ উঠবে ।
শশী মান্না বলে গেল না ?

সমাদ্দার : ও কি কখনো আকাশের দিকে তাকায় ?
ঘর দিয়েছে দেখুন পুব দক্ষিণ বন্ধ । হাওয়া আসবে কোত্থেকে ?
এখন কি মাস বলুন তো ?
আমার আবার বাংলা মাস মনে থাকে না ।

পথিক : [ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে] আষাঢ় ।
আষাঢ় কোথা হতে পেলে সাড়া···

সমাদ্দার : পদ্য বলছেন ?

পথিক : একটা গানের কলি।

সমাদ্দার : আসে নাকি ?

পথিক : একটু-আধটু

সমাদ্দার : ভাল ভাল। জয়তীও ভাল গাইতে পারত।

পথিক : সব জয়তীরাই গাইতে পারত। গাইতে দেয় না।

[উঠে দাঁড়ায়। গুন্ গুন্ করে গায়। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। নীরবতা।]

কোথাও যুঁই ফুটেছে মনে হয়। গন্ধ পাচ্ছেন ?

সমাদ্দার : কী বললেন, যুঁই ? কতদিন অইসব ফুল দেখিনি।

পথিক : [আপনমনে] মেসিনগানের সম্মুখে গাই যুঁই ফুলেরই গান।

সমাদ্দার : বেশ সিম্বলিক লাইনটা তো !

আপনার কি পদ্য লেখাও আসে নাকি ?

পথিক : আমার নয়—রবিঠাকুরের।

সমাদ্দার : ওষুধের সেলস্‌ম্যানগিরি করে করে লেখাপড়া সব ভুলে গেছি।

জানেন, ইস্কুলে আমিও রিসাইট করতুম।

জয়তী তো বলে, তুমি আর আগেকার তুমি নও।

অন্য মানুষ, হা-হা।

বেশ কথা বলতে জানে। গান জানত।

এখন কোথায় গেল সে গান ?

পথিক : আমরা সবাই একদিন অন্য মানুষ হয়ে যাব।

আমরা নিজেদের কণ্ঠস্বর আর চিনতে পারব না।

আমাদের চাওনি আলাদা হয়ে যাবে।

সমাদ্দার : দেখছেন তো ঘরে বেশ মশা। কি করে রাত কাটবে বলুন তো ?

পথিক : একটু পরেই চাঁদ উঠবে।

সমাদ্দার : মশা তাতে কমবে ?

পথিক : জোছনায় শহরটাকে অন্যরকম দেখাবে।

মাতালের মতো সেই ঘোলাটে আলোয়

অন্যরকম দেখাবে শহরটাকে দেখবেন।

সমাদ্দার : আমি আবার রাত জাগতে পারি না।

এ নিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে কতদিন
ঝগড়া হয়ে গেছে।
ও গল্প করছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হা হা।

পথিক : এক্ষুনি চাঁদ উঠবে। জোছনায় কি ঘুম আসে ?

সমাদ্দার : শশী মান্না লোকটা ঠগ, এমন একটা ঘর দিল।

পথিক : কে ঠগ নয় বলুন এ সমাজে ?

সমাদ্দার : এই মোমবাতিটাই সম্বল। শশী মান্না কিছুই দিয়ে যায় নি।

পথিক : চাঁদ উঠবে এক্ষুনি।

[হঠাৎ দমকা হাওয়ায় মোমবাতি নিবে গেল]

সমাদ্দার : ওই যাঃ, যা ভয় করছিলুম। বাতিটা নিবে গেল।
দেশলাই আছে ?

পথিক : ওই যে শশী মান্না ফেলে গেছে। ভিজে।

সমাদ্দার : চেষ্টা করে দেখুন না।

[পথিক দুবার চেষ্টা করল, কাঠি জ্বলল না]

সমাদ্দার : ক্লাব কোয়ালিটি কি আজকাল উঠে গেছে ?

পথিক : হয়তো।

সমাদ্দার : শশী মান্নাকেই ডাকা যাক।

[তিনবারের চেষ্টায় জ্বলল]

পথিক : এই জ্বলেছে।

সমাদ্দার : আমার ঘুম পাচ্ছে।

পথিক : ঘুমুন না আপনি।

সমাদ্দার : আপনি ? ব্যাটা শশী মান্না।

পথিক : আমি মেঝেতে শোব'খন।

সমাদ্দার : আপনার অনুমতি নিয়ে তাহলে

[সমাদ্দার পাশ ফিরে শোয়। মোমবাতিটা আবার নিবে যায়। পথিক চেয়ারে বসে থাকে। নীরবতা। দরজায় আলতো ধাক্কা। অন্ধকারে কে একজন ঢোকে]

পথিক : কে ?

[সঙ্গে সঙ্গে বিজলির আলো জ্বলে ওঠে। আগন্তুকের প্রবেশ।]

অনির্বাণ : আমার নাম অনির্বাণ চৌধুরী। আমাকে শশী মান্না পাঠালেন। এটাতো ৩৯ নম্বর ঘর ?

পথিক : শশী মান্না আপনাকে পাঠালেন এই রাত্তিরে ? ৩৯ নম্বর ঘরে ?

অনির্বাণ : তেতলার ৩৯ নম্বর ঘর তো এটাই ?

পথিক : এ ঘরে তো আমরা দুজন ?

অনির্বাণ : আমাকে নিয়ে তাহলে তিনজন।

পথিক : উনি কি জানতেন না আমরা এঘরে রয়েছি ?

অনির্বাণ : জানতেন বলেই বোধহয় পাঠালেন। অন্য ঘর খালি নেই। শুধু রাতটুকু থাকব।

পথিক : ' আলো জ্বলে উঠল কি করে ? ম্যাজিক জানেন নাকি ?

অনির্বাণ : আলো তো ছিলই। আপনি নিবিয়ে রেখেছিলেন।

পথিক : আলো ছিল না। শশী মান্না বলে গেছল।

অনির্বাণ : ওটা ওর স্বভাব। শশী বড় কিপ্টে।

[সমাদ্দারের তন্দ্রা ভেঙে যায়]

সমাদ্দার : আপনি ? এ ঘরে ? কোন বাইরের ঝামেলা ?

পথিক : শশী মান্না ওকে এঘরে পাঠিয়েছেন।

অনির্বাণ : আমার বিশেষ অনুরোধে······ওর কোনো দোষ নেই।

সমাদ্দার : এ ঘরে তিনজন।

অনির্বাণ : মালাকে নিয়ে চারজন।

সমাদ্দার : [লাফিয়ে উঠে] মালা···মানে মহিলা···এই পুরুষদের ঘরে ?

পথিক : তিন আর এক চার · তিনজন পুরুষ আর একটি মেয়ে এক্ষুনি বোধহয় চাঁদ উঠবে।

অনির্বাণ : তাহলে আপনারা যদি বলেন···বড় বিপদ। একটি মেয়ে বারান্দায় বসে রাত কাটাবে···

সমাদ্দার : [দারুণ উত্তেজিত হয়ে] এই ঘরে তা বলে ? আমার দু রাত্রি ঘুম হয় নি।

অনির্বান : মনে করুন না স্টেশনের ওয়েটিং রুমে আছি।

সমাদ্দার : শশী মান্না লোকটা ঠগ।

[উঠে গিয়ে হাঁক দেয়—মিঃ মান্না, মিঃ মান্না···কোন উত্তর নেই।]

অনির্বাণ ঃ এখন ওকে পাবেন না, হাওয়া খেতে গেছে।

সমাদ্দার ঃ হাওয়া খেতে গেছে···এই রাত্রে ?

অনির্বাণ ঃ তাহলে আপনারা অনুমতি দিলে···

পথিক ঃ একজন ভদ্রমহিলা বিপদে পড়েছেন যখন।

সমাদ্দার ঃ আমরা কি কম বিপদে পড়েছি পথিকবাবু।

অনির্বাণ ঃ থ্রি ইন্ অ্যা বোটের জায়গা, ধরুন না ফোর ইন্ অ্যা বোট। বিপদ আমারও।

সমাদ্দার ঃ আপনার বিপদ ? কী ঝামেলায় পড়া গেল। কী আশ্চর্য আর ঘর খালি নেই ?

অনির্বাণ ঃ সে কথাই তো বলল শশী মান্না।

সমাদ্দার ঃ সব ঘর ভর্তি ? কোনো মানুষের সাড়া শব্দ নেই তো ?

পথিক ঃ সবাই ক্লান্ত···সবাই হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনির্বান ঃ তাহলে যদি অনুমতি করেন···

পথিক ঃ অনুমতির কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

সমাদ্দার ঃ তিনি কী করে থাকবেন ?

অনির্বাণ ঃ স্রেফ্ বসে থাকা আর কি ?

সমাদ্দার ঃ আমরা ?

পথিক ঃ আপনি বলছেন আমরাও কি বসে রাত কাটাবো ? তাই না ?

সমাদ্দার ঃ Exactly.

পথিক ঃ ওই বারান্দায় চলে যাওয়া যাক। আমরা দুজন বারান্দায়, ওরা দুজন ঘরে।

সমাদ্দার ঃ ঝুল বারান্দায় ?

পথিক ঃ Exactly. ওই ঝুল বারান্দায়···এক্ষুনি চাঁদ উঠবে।

অনির্বাণ ঃ ইফ য়ু প্লিজ। দেখুন আমার কোনো উপায় ছিল না। মালাকে ডাক্তার দেখাতে হবে।

সমাদ্দার ঃ ডাক্তার ?

পথিক ঃ অসুস্থ ?

অনির্বাণ ঃ হ্যাঁ। ওর অসুখটা বড় peculiar···সব ভুলে যায়, আমাকেও, নিজেকেও, আপনাকেও ; আমাকেও, নিজেকেও, আপনাকেও। বড় মজার অসুখ···

পথিক ঃ সব ভুলে যায়···এ তো মজার অসুখ।

সমাদ্দার ঃ মজার বলছেন? এ তো সাংঘাতিক অসুখ।
একঘরে চারজন ··একটা কেলেঙ্কারি না ঘটে যায়।

অনির্বাণ ঃ কিছু হবে না, মিঃ সমাদ্দার।
মালা কোনো কথাই বলবে না হয়তো।
রাতে ওর ঘুম হয় না···জেগে থাকে।

সমাদ্দার ঃ আপনি ঠিক জানেন উনি কথা বলবেন না।

অনির্বাণ ঃ ঠিক জানি।

পথিক ঃ ঠিক ঠিক জানেন?

অনির্বাণ ঃ ঠিক ঠিক জানি। ওর কথা বলার কিছু নেই।

সমাদ্দার ঃ কথা বলার কিছু নেই!

পথিক ঃ কথা ছিল, তবু কথার পিছনে ছুটে
সব কথাগুলি কবে যেন গেছে টুটে।
কথার মালায় গাঁথা হয় কথকতা
ভিড় করে থাকে তারি মাঝে কত কথা।
তবুও কথার কিছু আজও আছে বাকি
কথাহীন কথা বলে দেবে কথা নাকি।

অনির্বাণ ঃ আপনি তো মশাই মহাগুণী লোক। গুরুদেব।

সমাদ্দার ঃ আগি গোড়াতেই টের পেয়েছিলুম।

পথিক ঃ গুণটা কোথায় দেখলেন?

সমাদ্দার ঃ পদ্য কি আর যার তার মাথায় আসে?
আপনি নিশ্চয়ই পদ্য লেখেন পথিকবাবু।

অনির্বাণ ঃ চমৎকার আপনার কথাগুলো। ভারী অর্থময়।
মালার খুব ভালো লাগবে।
কথাগুলো একেবারে ভেতরে চলে যায় তো।
আহা কি সুন্দর!
কথা ছিল তবু কথার পিছনে ছুটে
সব কথাগুলি কবে যেন গেছে টুটে।
আহা, ভারী চমৎকার।
আচ্ছা, এই সব কথা আপনি নিজে নির্মাণ করেন?

কী ভাবে করেন পথিকবাবু ?

পথিক : কী ভাবে তাতো বলে বোঝানো যাবে না।
এসে যায়…গাছে যেমন পাতা এসে যায়,
মেঘে যেমন জল এসে যায়…
তেমনি আর কি ?

অনির্বাণ : তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে মালাকে…

সমাদ্দার : ওই তো মুস্কিলে ফেললেন।
শশী মায়া আবার হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।
ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

পথিক : সে না হয় হবে।
কিন্তু এখন ভদ্রমহিলা কতক্ষণ বসে থাকবেন বাইরে ?

সমাদ্দার : সে রকম কি কোনো কথা ছিল ?
একটা মাত্র ঘর, তাতে চারজন।

অনির্বাণ : মাত্র এক রাত্রির জন্য।

পথিক : ঝুল বারান্দায়।

সমাদ্দার : ঝুল বারান্দায় ?

পথিক : এক্ষুনি চাঁদ উঠবে।

অনির্বাণ : তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে…

[চলে যায়। ওরা দুজন পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকে। নীরবতা। আলো নিবে যায়। আলো জ্বললে দেখা যাবে সেই ঘরটাতে খাটের ওপর বসে আছে মালা। অনির্বাণ এক গ্লাস জল কুজো থেকে গড়িয়ে ওকে দিচ্ছে। ঝুল বারান্দার সামনে একটি পর্দা টাঙানো।]

অনির্বান : এই নাও মালা, জল।
[মালা নিরুত্তর]
এই নাও জল।

মালা : ও, জল। আমি চেয়েছিলুম বুঝি।

অনির্বাণ : হ্যাঁ চেয়েছিলে। তেষ্টা পেয়েছিল তোমার।

মালা : পেয়েছিল বুঝি [অন্যমনস্ক] ?

অনির্বাণ : হ্যাঁ তোমার তেষ্টা পেয়েছিল। বললে, জল খাব।

আমি বললুম ঘরে গিয়ে দেখো। মনে আছে ?

মালা : কতদিন জল খাইনি।

[গ্লাস থেকে জল খায়। গ্লাসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দেয়।]

অনির্বাণ : মালা তুমি ওই খাটে গা এলিয়ে বিশ্রাম করো
সারাদিন অনেক ধকল গেছে তো।

মালা : আমরা এখানে এসেছি কেন ?

অনির্বাণ : তোমাকে ডাক্তার দেখাতে।

মালা : আমার কী হয়েছে ?

অনির্বাণ : কিছু হয়নি। একটু দেখিয়ে আমরা চলে যাব।

মালা : ' আমার কিছু হয়নি। তবে ডাক্তার দেখাব কেন ?

অনির্বাণ : আমিও দেখাব। আমার কি কিছু হয়েছে ?
এমনি দেখাতে হয়।
আমরা দুজনে ভাল থাকব।

মালা : তোমাকে আমার ভাল লাগে না।

অনির্বাণ : আমি জানি আমাকে তোমার ভাল লাগে না।
লাগবেই না তো। কারই বা ভাল লাগে ?
ভাল লাগাটা আলাদা ব্যাপার।
এই বর্ষাকালটা আমার ভাল লাগে না।
সন্ধ্যাবেলা ঘরে বসে থাকতে তোমার ভাল লাগে না।
সব জিনিষ সবার ভাল লাগে না।

মালা : আমি বাড়ি যাব।

অনির্বাণ : যাবে নিশ্চয়ই যাবে। আমিও বাড়ি যাব।
বাড়ি গিয়ে আমরা দুজন আর কোথাও যাব না।
আমরা বাড়ি যাব বলেই তো এসেছি।

মালা : আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

অনির্বাণ : বেশ তো, তুমি একাই যাবে। আমি সঙ্গে যাব কেন ?
আমি শুধু তোমাকে পৌঁছে দেব।

[মালা উঠে দাঁড়ায়। জানালার কাছে যায়। ফিরে আসে। পায়চারি করে।]

মালা ঃ না, আমি তোমার সঙ্গে যাব না।
তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

অনির্বাণ ঃ আস্তে মালা।

মালা ঃ তুমি আমাকে বানিয়ে বানিয়ে কত স্বপ্ন দেখিয়েছিলে।
ভুল কথায় বিশ্বাস করে ভুল স্বপ্ন দেখিয়েছো তুমি…
তুমি ভুল স্বপ্ন দেখিয়েছিলে…তুমি যাও…যাও…যাও
[কান্নায় ভেঙে পড়ে]

অনির্বাণ ঃ [ওকে সান্ত্বনা দিয়ে]
স্বপ্ন দেখিয়েছি ? সত্যি মালা, স্বপ্ন দেখিয়েছি তোমায়।
কে-না স্বপ্ন দেখতে চায় ? ভালোবাসাটাই তো স্বপ্ন।
তুমিও তো স্বপ্ন দেখতেই ভালোবাসতে।

মালা ঃ ভুল স্বপ্ন দেখিয়েছো তুমি। তোমার কথায় ভুলে
নিজের ঘর নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছি।

অনির্বাণ ঃ মালা, এ সব কি বলছো তুমি ?

মালা ঃ ঠিকই বলছি… তুমি যাও…আমি একাই চলে যাব।

অনির্বাণ ঃ এই ওষুধটা খাও তুমি।

মালা ঃ ওষুধ ? কেন ওষুধ খাবো ? আমার কি হয়েছে ?

অনির্বাণ ঃ তুমি ক্লান্ত মালা। তোমার ওষুধ খাওয়া দরকার।

মালা ঃ আমার কিচ্ছু হয়নি। আমি ওষুধ খাবো না।
তোমার হাতের ওষুধ আমি খাবো না।

অনির্বাণ ঃ লক্ষ্মীটি, তুমি নিজের হাতেই খাও।

মালা ঃ আমি খাব না। তোমার হাতেও না, নিজের হাতেও না।

অনির্বাণ ঃ তোমার রাত্রির খাবার বলে আসি।
[মালা জবাব দেয় না। অনির্বাণ বেরিয়ে যায়। বারান্দা থেকে পথিকের গলার স্বর 'একটু আসতে পারি']

মালা ঃ আসুন।
[পথিকের প্রবেশ]

পথিক ঃ নমস্কার। আপনাকে একটু বিরক্ত করলুম।

মালা ঃ [চকিত হয়ে] আপনি ? কীভাবে এলেন ?

এ ঘরে আরও কেউ ছিলো নাকি ?

পথিক : আমরা দুজন। আমি আর সমাদ্দার। ঝুল বারান্দায়।
আমার নাম পথিক রায়।
এই ঘরের মৌলিক বাসিন্দা ছিলুম আমরাই
অর্থাৎ আমার আর সমাদ্দারেরই থাকার কথা ছিল।
তেমন জরুরী কিছু নয়…আপনাদের দিয়ে দেওয়া হল…
আপনাদের জরুরী ছিল। আমরা তাই ঝুল বারান্দায়।
কোনো অসুবিধে নেই।

মালা : ঝুল বারান্দায় রাত কাটাবেন ? বাইরে ? এই রাতে।

পথিক : যে কোনো জায়গাতেই রাত কাটানো যায়…
রাস্তায়, ফুটপাতে, ওয়েটিং রুমে।
ওপরে মাথার ওপর আর কিছু না হক আকাশ…
বেশ ভালই তো। এক্ষুনি চাঁদ উঠবে।
আজকে কি তিথি জানা আছে ?

মালা : না, জানা নেই।

পথিক : চৌধুরীর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলুম। একটু জল নেবো বলে এসেছি। নিতে পারি ?

মালা : দিন, আমি গড়িয়ে দিচ্ছি।

[কুজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দেয় মালা]

পথিক : (জল খেয়ে) অশেষ ধন্যবাদ।

[মালা নিরুত্তর]

আপনি জল দিলেন, তৃষিতকে, সে জন্য ধন্যবাদ।

মালা : পোষাকী কথা, না বললেও ক্ষতি ছিল না।

পথিক : ক্ষতি না হলেও, সৌজন্যের ঘাটতি হত। আপনারা হঠাৎ এসে পড়লেন তাই না ?

মালা : আপনি ?

পথিক : হঠাৎই বলতে পারেন। সঙ্গে এক সহযাত্রী ওই ঝুল বারান্দায় ? ডাকবো ?

মালা : ওই বারান্দায় রাত কাটবেন ? তার চেয়ে এ ঘরেই সবাই

জেগে রাত কাটাই না কেন ?

পথিক : কথাটা উত্তম। কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়।

মালা : কেন জানতে পারি কি ?

পথিক : কেননা আপনি একজন নারী। আপনার দাবি সর্বাগ্রে।
তা না মানলে আমাদের শিভালরির ঘাটতি হবে।

[জানালার কাছে গিয়ে]

সমাদ্দার, ভিতরে আসুন।

[সমাদ্দারের প্রবেশ। মালাকে দেখিয়ে]

ইনিও আমাদের মত অতিথি। আজকের মতো।

সমাদ্দার : (মালার প্রতি) নমস্কার, বড় বিপাকে পড়েছি।
শশী মান্নাই যত নষ্টের গোড়া।

মালা : শশী মান্নার খোঁজ পেলেন কি ?

সমাদ্দার : কাজের সময় ওর খোঁজ মেলে না।

মালা : দরকার নেই শশী মান্নার। ওকে ছাড়াই আমরা থাকতে পারব।

সমাদ্দার : এই খুল বারান্দায়…?

পথিক : এক্ষুনি চাঁদ উঠবে। মন্দ কি। ওপর থেকে শহরটাকে দেখতে লাগে সুন্দরী বাঈজীর মতো।

মালা : উপমাটা যুৎসই হল কি ?

পথিক : উপমা জিনিষটা আসল নয়। আসলের কাছাকাছি একটা কিছু বলা।

মালা : ওটা সেই সংস্কৃত কবির জন্য তোলা থাক
যাঁর কথায় কথায় উপমা। শেষকালে উপমাও লজ্জা পেত।

পথিক : ভদ্রলোক এ যুগে জন্মালে কবিত্বের পাশ নম্বর পেতেন না।

সমাদ্দার : (সহাস্যে) একজন কবি কম হত।
পাঠকদের এটুকুই থাকত সান্ত্বনা।

মালা : না না। কবিতার খুবই জরুরী প্রয়োজন
এই অসুস্থ পৃথিবীর।
কবিতা ছাড়া মানুষের অস্তিত্বই বিপন্ন
পৃথিবীর বড় আত্মীয় এই কবিতা।

পথিক : আপনি গুণগ্রাহী
আপনাকে আমার প্রয়োজন।

সমাদ্দার : কি রকম প্রয়োজন ?

পথিক : মানুষের যেমন প্রয়োজন মানুষের।

মালা : আপনি কবিতাকে কীভাবে পেয়েছেন
জানতে বড় সাধ হয়
আমি এককালে খুব কবিতা ভালবাসতুম
এখন কবিতা থেকে কত দূরে সরে এসেছি।

পথিক : সেটাই আপনার অসুখ···

মালা : (ম্লান হেসে) বলতে পারেন অসুখের কারণ।

সমাদ্দার : আমাদের সবারই অসুখ
এই আমার যেমন ঘুম না পাওয়া
আমি দুরাত্রির ঘুমোইনি।

মালা : আমিও কতদিন ঘুমোইনি
ঘুম এলেই কারা যেন কড়া নেড়ে
জাগিয়ে দিয়ে যায়।

পথিক : পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই চোখে ঘুম নেই।

সমাদ্দার : আপনি যেন ফিলজফারের মতো কথা বলেন।

পথিক : খাঁটি কথা সমাদ্দার বাবু, পৃথিবীর চোখে ঘুম নেই।

মালা : আমাদেরও ঘুম হবে না আজ
এই ঘরে আপনি আমি আপনি।

পথিক : এবং আপনার স্বামী।

মালা : স্বামী নন। স্বামী হতে চান।

সমাদ্দার : অ্যাঁ, ইলোপমেণ্ট ? আপনাকে ঘর থেকে বার করে এনেছে ?

মালা : না, আমি স্বেচ্ছায় এসেছি প্রণয়ের কাছ থেকে।

পথিক : আপনি ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত।

মালা : পৃথিবীও কম ক্লান্ত নয়।

পথিক : ক্লান্তিটাও তাদেরই সাজে যাদের প্রচুর অবসর।

সমাদ্দার : অবসর নেই বলেই তো ক্লান্তি।
আমরা জোয়ালে-বাঁধা জন্তুর মতো

পরিশ্রম করি দিনরাত, শুধু বেঁচে থাকার জন্য।

পথিক : না, আপনারা পরিশ্রম করেন অন্যের চেয়ে ভালো থাকার জন্য।

সমাদ্দার : কে তা না চায় ? তা বলে Not by bread alone.
শুধু রুটির জন্য নয়।

পথিক : যা হোক আপনিও তাহলে বললেন কথাটা।

মালা : যত বড় মিথ্যাই হোক
আমরা বুঝি রমণীয় কথা শুনতেই ভালবাসি।

পথিক : মিথ্যার ছলনায় নিজেকে ভুলিয়ে রাখা।

মালা : [দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্যমনস্কভাবে]
প্রণয়ও এই ছলনাই করেছিল,
ভালবাসেনি।

পথিক : ক্ষতি নেই, ভালবাসাতেই হবে এমন কোনো কথা ছিল কি ?

সমাদ্দার : নিশ্চয় ছিল, অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে যখন।

মালা : না কেউ সাক্ষী ছিল না। শুধু সে আর আমি···।

পথিক : আর কারো সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল কি ?
শুধু দুটি হৃদয়ের সাক্ষীই কি যথেষ্ট নয় ?

সমাদ্দার : এ সব কি বলছেন ?
আমার কেমন জানি মাথা ঘুলিয়ে যাচ্ছে।
এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি।

পথিক : কিছু কিছু কথা থাকে যা আমরা শুনতে পাই না,
কিন্তু পেলে ভাল হত।

মালা : আচ্ছা এই রাত্রে একই ঘরে আমরা কি করে এসে পড়লুম ?

সমাদ্দার : শশী মান্নার কারসাজি।
সে সব জানে, আমাদের ঘুম কেড়ে নেবার জন্য
এটা ওর ফন্দি।

মালা : ঘুম ? আহ্, আমি কতদিন ঘুমুইনি।

পথিক : আমাদের ঘুম নেই, ঘুম পলাতক
যদি চাঁদ ওঠে আমরা সেই মাতাল জ্যোৎস্নায়
শুধু বেড়াবার স্বপ্ন দেখব।
আমরা ঘুমুতে পারব না কোনোদিন।

[দরজায় শব্দ]

পথিক : কে ?

[অনির্বাণের প্রবেশ]

অনির্বাণ : (পথিকের প্রতি) বেশ লাগছিল আপনার কথাগুলো।
মালা, তুমি ভালো আছো তো ?

[মালা নিরুত্তর]

আমি জানি, আমাকে আর ভাল লাগে না তোমার ।
আমি জানি মালা, তবু...

মালা : তুমি আর ছলনার কথা বলো না অনির্বাণ ।
তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে ।

পথিক : (বিব্রত হয়ে) আপনারা কথা বলুন, আমরা চলি ।

অনির্বাণ : কোথায় ?

সমাদ্দার : ওই ঝুল বারান্দায় ।

মালা : না, আপনারা যাবেন না আমার একা থাকতে ভয় করছে।

অনির্বাণ : ওই আবার সুরু করলে
তুমি একটু ঘুমোও বরং
আমি শশী মাস্নার খোঁজ নিয়ে আসি ।

[চলে যায়]

পথিক : মালা, আপনার বিশ্রাম দরকার ।

সমাদ্দার : ওই লোকটিকে আপনি ভালোবেসেছিলেন ?

মালা : ও আমাকে ভালবাসত, হয়তো এখনও বাসে,
আনুগত্য আছে তার, অন্য কিছু নেই
আমাকে কতটুকু জানে সে ?

পথিক : আর প্রণয় ? সে পেল না কেন আপনাকে ?

মালা : পেয়েছিল বলেই বুঝি হারাতে দ্বিধা করল না ।
সে জানল না কত দুঃখে চলে আসতে হয়েছে
আমায় সে জানল না ।
কী ভুলের জালে জড়িয়েছি সবাই।

সমাদ্দার : কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে
আমি যাই ঝুল বারান্দায় ।

[চলে যায়]

মালা : ভুল আমারও পথিকবাবু।

পথিক : না, না, কারো কোনো ভুল নয়
এ হল যে যার ভূমিকায় অভিনয় করা।

মালা : বিশ্বাস করুন, আমি এখন ফিরে যেতে চাই।

পথিক : নিশ্চয়ই ফিরে যাবেন ?

মালা : না, আমি আর বাড়ি ফিরব না,
আমি অন্য কোথাও ফিরে যাব।

পথিক : আমরা কেউ বাড়ি ফিরব না
কেনই বা ফিরব ? কে আছে আমাদের জন্য
বসে এই অবেলায় ?
কেউ বসে নেই···সব যে যার পথে চলে গেছে···
কেউ বসে নেই।

মালা : আমি কি করব পথিকবাবু ?

পথিক : একদিন নিজেই নিজের পথ খুঁজে পাব আমরা সবাই।

[বাইরে শব্দ]

পথিক : কে ?

[অনির্বাণের প্রবেশ]

অনির্বাণ : মালা, তুমি কি আমার সঙ্গে যাবে ?
একটা ট্রেন আছে রাত দুটোয়
চলো আমরা চলে যাই।

[মালা চুপ করে থাকে]

পথিক : রাতের রেলগাড়ি অনেকদূর চলে যাবে
অনেক অনেক দূরে।

মালা : আমি বাড়ি ফিরে যাব।

অনির্বাণ : বাড়ি ফিরে যাবে ? একা ? প্রণয়ের কাছে ?
সে তোমাকে ফিরিয়ে নেবে না কোনোদিন।

মালা : সে আমি বুঝব, তুমি যাও অনির্বাণ।

অনির্বাণ : তুমি অন্ধকারে তলিয়ে যাবে মালা
তুমি চলে এসো।

আমি তোমাকে আলোতে নিয়ে যাব,
যেখানে পৃথিবীর উজ্জ্বল শস্যেরা হাওয়ার ভিতরে খেলা করে

মালা : সে তোমার সাধ্য নেই অনির্বাণ।

অনির্বাণ : আমি তোমাকে যদি জোর করে নিয়ে যাই।

মালা : (ম্লান হেসে) আমি একা নই অনির্বাণ।
আমরা কেউ একা নই।

অনির্বাণ : [কাতরস্বরে]
মালা, চলো লক্ষ্মীটি
দুটোয় রাতের রেলগাড়ি।
আমরা অনেক দূর পাড়ি দেব
যেখানে ভোর হবে…আলো ফুটবে
ঘাসের ওপর জমে থাকবে শিশির
সুবর্ণরেখার জলে টলটল স্রোতে পা রেখে
আমরা হেঁটে নদী পার হয়ে যাব।
যাবে ? যাবে মালা ? যাবে ?
তুমি ভেবে দ্যাখো মালা, ট্রেনে চড়তে কত ভালবাসতে
এই গুমোট ঘরে কেন থাকবে ?
বাইরে কতো বড়ো পৃথিবী, কত তারা তব আকাশে
চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি,
চলো মালা।

পথিক : (মালার প্রতি) যাবেন ?

মালা : যাব না, যাব না, কিছুতেই যাব না ওর সঙ্গে।
আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবে, ভুল জায়গায় নামাবে
ভুল পৃথিবীর সামনে আমাকে দাঁড় করাবে।
[মামার প্রবেশ গলা খাকাড়ি দিয়ে]

মামা : [স্মিতহাস্যে] আপনাদের সব কুশল তো ?
ভোর হতে আর দেরি নেই
কাল সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
প্রত্যেকের জন্য আলাদা ঘর, আলাদা বারান্দা,
আর আলাদা আকাশ।…

পথিক : চাঁদ ডুবে গেছে নাকি ?

মান্না : চাঁদ উঠেছিল বুঝি ? টের পাইনি
এত্তো সব ঝামেলা···কী বলবো স্যার ।

[সমাদ্দারের প্রবেশ]

সমাদ্দার : এ শহরে সবাই ঘুমিয়ে
শুধু আমাদেরই ঘুম নেই ।
এই যে শশী মান্না মশাই···আপনার কারসাজি তো বেশ
কাউকে ঘুমুতে দিলেন না ।

মান্না : আমিও ঘুমুইনি স্যার ।
কারো চোখেই ঘুম নেই ।

মালা : (আপনমনে) আমি কতদিন ঘুমুইনি···কতদিন ··

পথিক : আমরা সবাই বিস্তর ঘুমহীন রোগে ভুগছি
এই পৃথিবী কখনো ঘুমোয় না ।
সেও সূর্যের চারিদিকে ঘুরে চলেছে
একটু হেলে···ঘাড়টা একটু কাৎ করে
ঘুরছে ঘুরছে ঘুরছে···ওর ঘুম নেই ।
কোনোদিন ঘুমুবে না সে ।

অনির্বাণ : মালা, চলো বেরিয়ে পড়ি
এখানে থাকলে তোমার ঘুম কখনই হবে না
এসব শশী মান্নার কারসাজি ।

মান্না : এখন কোথায় যাবেন ? বাইরে অন্ধকার ।

পথিক : এক্ষুনি চাঁদ উঠবে,
বাতাসে যুঁই ফুলের গন্ধ ।

মালা : আমি জ্যোৎস্নায় ছাতে ঘুমুতে ভালবাসতুম ।

অনির্বাণ : তাই চলো মালা, আমরা গাড়ির জানালায় মাথা রেখে
জ্যোৎস্নার আলোতে ঘুমিয়ে পড়ব ।

পথিক : আপনি যান, কোথাও চলে যান
যে যেখানে পারেন চলে যান
এখানে দম বন্ধ হয়ে আসছে ।

মালা : (গভীর স্বরে) অনির্বাণ, তুমি আমাকে সত্যি ভালোবাস ?

সমাদ্দার ঃ (একটু বিব্রত হয়ে) আমরা বরং যাই।

মালা ঃ যাবেন কেন ? আমরাই চলে যাব।

অনির্বাণ ঃ যাবে মালা ? যাবে ?

মালা ঃ বলো না অনির্বাণ, তুমি আমায় ভালবাসো ?

অনির্বাণ ঃ চন্দ্র সূর্য সাক্ষী।

মালা ঃ তাহলে অনির্বাণ তুমি ভালোবাসার পরিচয় দাও
আমাকে প্রণয়ের কাছে নিয়ে চলো···

অনির্বাণ ঃ (হতভম্ব হয়ে) মালা, কী বলছো মালা ?

মালা ঃ হ্যাঁ অনির্বাণ, আমি প্রণয়ের কাছে যেতে চাই
তুমি কোনোদিন আমাকে পাবে না অনির্বাণ
এ তোমার ভুল অন্বেষণ
আমাকে বাড়ি যেতে দাও।

অনির্বাণ ঃ মালা, সত্যি বলছো মালা ? সত্যি বলছো ?

মালা ঃ হ্যাঁ অনির্বাণ। আমি প্রণয়ের কাছে ফিরে যাব।

পথিক ঃ এক্ষুনি চাঁদ উঠবে
অন্ধকারে ভেসে আসছে যুঁই ফুলের গন্ধ
চলুন আপনাদের এগিয়ে দিয়ে আসি
রাত দুটোয় ট্রেন।

[সবাই যে-যার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।]

প ট ক্ষে প

বাতিঘর

বুবু-কে

চরিত্র লিপি

শান্তা নীলাদ্রি শবরী

রোহিণী

বা তি ঘ র

[সামনে অবারিত সমুদ্র ঢেউ ভাঙছে বালুবেলায়। দিগন্ত ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে জাহাজ। সমুদ্রসৈকতে মুখ উপুড় কয়েকটা জেলে নৌকো। পিছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাতিঘর। সমুদ্রের ধারে বাতিঘরের কাছে একটা ছোট্ট বাড়ির বারান্দায় বসে আছে নীলাদ্রি। তার সামনে বালির পাহাড় তৈরী করে খেলা করছে দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে শান্তা]

শান্তা : (পাহাড় সাজাতে সাজাতে)। এটা আমার পাহাড় !

নীলাদ্রী : এটা পাহাড়, না ইগলু ?

শান্তা : ইগলু আবার কী ?

নীলাদ্রি : ইগলু হল এস্কিমোদের বাড়ি
বরফের বাড়ি।

শান্তা : না এটা পাহাড়, আমার পাহাড়
সমুদ্র ওকে ছুঁতে পারবে না।

নীলাদ্রি : সমুদ্রের বুকে কত পাহাড় ঘুমিয়ে আছে
তার জলের অতলে।

শান্তা : (আরও বালি চাপিয়ে) আমি আরও উঁচু করে দেব
পাহাড়কে সমুদ্রের নাগালের বাইরে।
এই দ্যাখো কাঁকড়া।

নীলাদ্রি : ওরা লুকোচুরি খেলতে ভালোবাসে
বালিতে লুকোয় ওরা আপন খুশিতে।

শান্তা : একটা…দুটো…তিনটে কাঁকড়া
এগুলো খুব ভাল, আমার পোষা।

নীলাদ্রি : কী করে চিনবে তাদের ?
সব কাঁকড়াই তো দেখতে অবিকল এক

একই রকম তাদের ঘোরাফেরা, ব্যবহার।

শান্তা : মোটেই না, এদের সব্বাইকে চিনি আমি
চিনি আমি আলাদা করে
এগুলো আমার পোষা।

নীলাদ্রি : জান তো উঁচু থেকে, দূর থেকে
মানুষকেও অবিকল এক মনে হয়
যদি চড় বাতিঘরে, দেখবে নিচের দৃশ্য
মানুষের চলাফেরা, সবই ভারি মজাদার ছবি।

শান্তা : (বাতিঘরের দিকে তাকিয়ে) আকাশের সমান উঁচু ?

নীলাদ্রি : ওখান থেকে নিচের দিকে তাকালে
দেখা যায় লাল নীল হলদে বেগুনি,
পোশাকের মুখোশ পরা যেন সব কাঁকড়ারই দল
ঘুরছে ফিরছে, কেউ বা শুয়ে আছে সমুদ্রের তটে।

শান্তা : সমুদ্রের সঙ্গে কি ডাঙার
চিরকালের আড়ি ?

নীলাদ্রি : আড়ি নয়, খুব তাদের ভাব।

শান্তা : তাহলে সমুদ্র কেন তার ঢেউয়ের আঘাতে
আমার বালির পাহাড় নেবে ভাসিয়ে ?
কেন সে পর পর ছুঁতে আসে তাকে ?

নীলাদ্রি : খুব বেশি ভাব বলে
বালিকে না ছুঁয়ে সে থাকতেই পারে না।

শান্তা : সমুদ্রের শেষ কোথায় ?

নীলাদ্রি : তার শেষ নেই।

শান্তা : (অবাক হয়ে) যত দূর যাই শেষ নেই তার ?

নীলাদ্রি : তার শুরু নেই শেষও নেই
মানুষের মনের মতো, আদি অন্ত নেই
সে শুধু পৃথিবীকে আদরে জড়িয়ে রাখে
মায়ের মতো
তার প্রাণকে, তার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

শান্তা : কী করে জানলে তুমি ?

নীলাদ্রি : কী করে জানলুম ? আমি যে জাহাজে
চড়ে সারা দুনিয়া ঘুরে বেরিয়েছি
দেশ থেকে দেশান্তরে, বন্দরে শহরে
নতুন মানুষজন, ঘরবাড়ি, সভ্যতা সমাজ
কত কিছু দেখেছি যে আমি !

শান্তা : এই বাতিঘর ?

নীলাদ্রি : এ হল নাবিকের আকাশপ্রদীপ।
সমুদ্রের বুকে যারা ভাসে
তাদের পথ দেখায় সারারাত জেগে
পথহারাদের পথের নিশানা।

শান্তা : (হাততালি দিয়ে) এই দ্যাখো আমার কাঁকড়াগুলো
কী ছুটোপাটি লাগিয়েছে
একটা· ·দুটো···তিনটে···চারটে···
কাঁকড়াদের সভা বসে গেছে।

নীলাদ্রি : ঠিক মানুষেরই মতো
যদি চড় বাতিঘরে দেখবে নিচের দৃশ্য
মানুষের ঘরবাড়ি দেখতে যেন পুতুলের ঘর
সব যেন তোমার ওই কাঁকড়াদের বালির পাহাড়।

শান্তা : বাতিঘর কখন ঘুমোয় ?

নীলাদ্রি : সূর্য জাগলে তার ছুটি।
বাতিঘর তো সমুদ্রের রাত্রির পাহারা
সমুদ্র ঘুমোয় না, বাতিঘরও না
সারারাত সে জেগে থাকে একা একা।

শান্তা : কার সঙ্গে সে কথা বলে ?

নীলাদ্রি : যারা সমুদ্রের পথ খোঁজে
যারা শুধু নক্ষত্রের ভাষা বুঝে চলে
বাতিঘর তাদের সঙ্গেই আলোর সংকেতে
কথা বলে।

শান্তা : যখন ঝড় ওঠে ?

নীলাদ্রি : ঝড়ের ডানা চেপে ধরি আমরা

নিকষ কালো মেঘের বুক চিরে
পৌঁছে দিই আলোর ঠিকানা।

শান্তা : (বালির পাহাড়ে হাত দিয়ে) ওই দ্যাখো আবার পালাল
একটা···দুটো···তিনটে···চারটে
আয়রে আয় আমার কাঁকড়াসোনা আয়

[হাততালি দিয়ে হাসে]

নীলাদ্রি : (শান্তার সুরে সুর মিলিয়ে) আয়রে আয়
শান্তার কাঁকড়াসোনা আয়।

শান্তা : (হঠাৎ খেলা ফেলে) মা···আমার মা কখন আসবে?

নীলাদ্রি : (ঘড়ি দেখে) এই সময় হল।

শান্তা : (সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো
কত বড় ঢেউ।

[ছুটে যায়]

নীলাদ্রি : বেশী দূরে যেও না শান্তা।

শান্তা : আমি ঢেউয়ের সঙ্গে ছুটব।

[বলতে বলতে সে ছুটে চলে যায়। শুধু সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ। শোনা যায় ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে আসা বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। সন্ধ্যে হয়ে আসে। জ্বলে ওঠে বাতিঘরের আলো। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল শবরী—শান্তার মা।]

শবরী : খেলাঘর বানাচ্ছ নীলাদ্রি?

নীলাদ্রি : আমি নয় শবরী, তোমার মেয়ে শান্তার
হাতে গড়া কাঁকড়াদের বাড়ি।

শবরী : শান্তা, শান্তা কোথায়?

নীলাদ্রি : শান্তা দৌড়চ্ছে ঢেউয়ের সঙ্গে।

শবরী : এককালে আমি দৌড়ে ফার্স্ট হতুম
তুমি ভাবতে পার?

নীলাদ্রি : সবই ভাবতে পারি শবরী
থামা মানে পিছিয়ে পড়া।
তাই শুধু চলো, এগিয়ে চলো
পিছনে তাকাবার দরকার কী?

শবরী : কথায় বলে দৌড়ুতে পারলে দাঁড়াবে না।

নীলাদ্রি : (হাত ধরে টেনে) আর দাঁড়াতে পারলে বসবে না
এখন তো বসো।

শবরী : (হেসে) তোমার বাতিঘর সাক্ষী।

নীলাদ্রি : কীসের ?

শবরী : তুমি আমায় হাত ধরে বসালে।

নীলাদ্রি : সে সবই দেখে কিন্তু বলে না কিছুই।

শবরী : (আরও ঘন হয়ে) আমার রক্তাক্ত হৃদয়।

নীলাদ্রি : (আদর করে) সমুদ্র সব শান্ত করে দেবে
সে তার নীল জলে ধুয়ে মুছে দেবে সব।

শবরী : আমার হৃদয় পর্যন্ত সে পৌঁছুতে
পারবে কি নীলাদ্রি ?
সে তো ছুঁতে না ছুঁতেই ফিরে যায়
নিজেরই গভীরে।

নীলাদ্রি : ওটা তার ভারসাম্য
নইলে যে সব অতলে হারিয়ে যেত।

শবরী : আমি ব্যালান্স রেসে প্রাইজ পেতুম
কিন্তু কী হল ?

নীলাদ্রি : কে উত্তর দেবে শবরী ?
সমুদ্র তো একা-একাই কথা বলে।

শবরী : উত্তর না পেলে আমি বাঁচব না
জীবনের জটিলতার পাকে বন্দী হয়ে
বিবর্ণ হয়ে গেছে সব।

নীলাদ্রি : সুন্দরের মৃত্যু নেই
নিজেরই ভস্ম থেকে সে আবার বেঁচে ওঠে
তুমি নিরাশ হয়ো না।
তোমাকে নতুন করে বাঁচতে হবে
বাঁচাতে হবে জীবনের যা-কিছু সুন্দর।

শবরী : চারিদিকে কাঁটাবন
চলতে গেলেই পায়ে লাগে।

নীলাদ্রি : তাতেই তো বাঁচার আনন্দ।
লতার মতো বাঁচা নয়
পুষ্পিত তরুর মতো, সূর্যের মদের মতো
লাল রঙ রোজ পান করে।
শবরী : জীবন কবিতার উপমা নয়।
নীলাদ্রি : কবিতাই জীবনের উপমার ঋণে
নিজেকে নির্মাণ করে।
শবরী : আমাদের বিবর্ণ জীবনে
কবিতা কোথায় ?
সে তো গদ্যময়, সংগীতবিহীন।
নীলাদ্রি : গদ্য কিন্তু হেলাফেলা নয়
কবিতারই উৎস থেকে গদ্যের নির্মিতি
সচল, সুন্দর।
সমুদ্রের ঢেউ যদি কবিতার লাবণ্যে চঞ্চল
বালিভরা শক্ত তট গদ্যের বসতি।
শবরী : সমুদ্র কি আমার সব সন্তাপ
জুড়োতে পারে ?
নীলাদ্রি : সমুদ্রের রহস্য জানে ওই নীল আকাশ,
তেজস্বী দুরন্ত সূর্য আর সিক্ত, তপ্ত বালুবেলা।
শবরী : শান্তাকে নিয়েই যত ভাবনা আমার।
নীলাদ্রি : (দূরে তাকিয়ে) ওই দ্যাখো হরিণশিশুর মতো
শান্তা দৌড়চ্ছে খেলাচ্ছলে।
শবরী : শান্তা এক অদ্ভুত মেয়ে
এমনিতে মা মা করবে সারাক্ষণ
কিন্তু বাবা-অন্ত প্রাণ
যাকে আমি ছেড়ে এসেছি তার জন্য
তার আকুলতা।
নীলাদ্রি : আমরা ওকে ভুলিয়ে রাখব শবরী
ওকে ভরিয়ে রাখব ভালোবাসায়।
শবরী : এত বড় দাবি, আমাদের দুজনের দাবি

তুমি পারবে পূরণ করতে ?

নীলাদ্রি : এখন নয়, সময় এলে প্রমাণ দেব।
আমি ছিলুম ঘর-পালানো, বাপে-তাড়ানো
মা-মরা দস্যি ছেলে
সারা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছি একটু মমতা,
একটু সান্ত্বনা, একটু আশ্রয়ের আকুলতায়।
শান্তার মনটা আমি বুঝি।

শবরী : জানি না, আমি কিছু জানিনা
একবার আগুনে হাত পুড়িয়েছি আমি।

নীলাদ্রি : আমি তাতে প্রলেপ দিতে চাই
তুমি বিশ্বাস করো।

শবরী : আমার সব ইতিহাস জেনেও ?

নীলাদ্রি : তোমার জন্মের জন্য তুমি দায়ী নও।
তোমার মায়ের ভুল কেন সারা জীবন
বইতে হবে তোমাকে ?
কী তোমার দোষ ?

[নীরবতা]

শবরী : বিশ্বাস করো নীলাদ্রি, আমি কিছু জানতুম না
মা আমাকে চিরকার রেখেছেন দূরে দূরে
হস্টেলে, কনভেন্টে।
বাবাকে কোনোদিন দেখিনি,
শুনতুম তিনি বহুদিন নিরুদ্দেশ।
সবারই বাবা আসতেন হোস্টেলে দেখা করতে
আমার কোনো ভিজিটর ছিল না।
কার্সিয়ঙে সেই ক'টা বছর কী ভীষণ নিরুত্তাপ,
নির্জন বিষাদ!
কী ভীষণ নিঃসঙ্গ করুণ!
আমি আর সেইরকম জীবন চাই না শান্তার।

নীলাদ্রি : মানুষ মানুষকে দুঃখ দিয়েই বুঝি সুখ পায়,
তার কোনো পাপবোধ নেই।

শবরী ঃ আমার মেয়ে ?
তুমি তাকে সইতে পারবে ?
যদি তোমার আমার মাঝখানে তার ছায়া পড়ে ?
নীলাদ্রি ঃ আমারও অতীত আছে তা তো জান
স্বাতী আমাকে ছলনা করেছিল ।
শবরী ঃ আমার বয়স !
[খানিকক্ষণ নীরবতা]
আমার বয়স ? তুমি আমার শরীরটা
ভালো করে দ্যাখো নীলাদ্রি,
তুমি স্বপ্নের চোখে তাকিও না ।
আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না,
যাকে সব উজাড় করে দিয়েছিলুম
সে হেলাফেলায় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল
এখন আমার আর কী আছে দেবার ?
কী আছে ?
নীলাদ্রি ঃ দোহাই তোমার, ও কথা বোলো না
আমাকে ভালোবাসতে দাও ।
শবরী ঃ (অন্য মনে) ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে
[নীরবতা]
এরকম সৃঞ্জয়ও বলত,
দিনরাত কানের কাছে মৌমাছির মতো
সেই অলৌকিক গুঞ্জরণ ঃ
আমাকে ভালোবাসতে দাও···ভালোবাসা শর্তহীন
সে সব-কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে ।
আহ্, সেই অসামান্য দিনগুলি থেকে খসে-পড়া
স্বপ্নের পালক পড়ে আছে পাহাড়ী ঝরণার পাশে
পড়ে আছে ডানাভাঙা পাখি ।
পাহাড়ের রূপোলী নৈঃশব্দ্য জানে,
জানে তিস্তার দুরন্ত জল
সেই সব স্মৃতি আমি দুহাতে ঝেড়ে ফেলে এসেছি ।

নীলাদ্রি ঃ তাই এসো নতুন স্বপ্নের নীড়ে।

শবরী ঃ আমার ভয় করছে,
আমি নতুন করে কিছুই ভাবতে পারছি না।

নীলাদ্রি ঃ আমার তাড়া নেই শবরী,
তোমার যখন সময় হবে তখুনি
আমারও সময়।

শবরী ঃ জন্মাবধি মুখোশ-পরা ভয়
আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।
যতবার তার কাছ থেকে পালাতে চাই
সে হিংস্র ছায়ার মত আমাকে তাড়া করে।

নীলাদ্রি ঃ তুমি অধীর হোয়ো না।

শবরী ঃ আমি যতবার দূরে চলে আসি
ততবার সেই স্মৃতি হানা দেয়
আমাকে দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে দিয়ে যায়।
কেন স্মৃতি ? কেন দুঃখ ? কেন এই নির্লিপ্ত বিষাদ ?
কেন ? কেন ? কেন ?

[হাত দিয়ে মুখ ঢাকে]

নীলাদ্রি ঃ তুমি নিজেকে বুঝতে শেখো।

শবরী ঃ কি বুঝব ? কেমন করে বুঝব ?

নীলাদ্রি ঃ সমুদ্র যেমন বুঝতে পারে তার গভীরকে
আকাশ যেমন জানে তার অসীম অনন্তকে।

শবরী ঃ সে কি বোঝা ? না বোঝার রূপক ?

[নীরবতা]

আমি জানিনে, কিচ্ছু জানিনে।
তুমি ঠিক জান ? ভুল করে ভুল পথে
পা দাওনি তো ?

নীলাদ্রি ঃ কীসের ভুল ?

শবরী ঃ এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা ?
ঘর সে তো মরীচিকা…তৃষ্ণার্তকে নিয়ে যায়
লোভ দেখিয়ে

তারপর শূন্যে মিলিয়ে যায়।
পড়ে থাকে তপ্ত মরু, নির্মম সূর্যের তাপ
আর তৃষাতুর দিগন্ত জুড়ে
মৃত্যুর হাতছানি।

নীলাদ্রি : আজ এ কথা কেন ?

শবরী : শান্তা, কী ভাববে শান্তা ?

নীলাদ্রি : ও হবে আমাদের দুজনের মাঝখানে
স্বপ্নের সেতু।

শবরী : যে মানুষ আমাকে বঞ্চিত করেছে
তারই রক্ত ওর গায়ে।

নীলাদ্রি : তুমি ওকে বুঝতে দাও
ভালোবাসাহীন জীবন কী করুণ অভিশাপ!
তুমি ওকে সে কথা বোঝাও।

শবরী : সে কি অতশত বুঝতে পারে ?

নীলাদ্রি : সে তো জানে তুমি সব ছেড়ে
চলে এসেছ।
সে তো জানে তুমি নিঃসঙ্গ একাকী।
সে তো জানে কীভাবে বঞ্চিত তুমি!

শবরী : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না
জীবনের স্বপ্ন দেখা যাকে দিয়ে শুরু
সে দস্যুর মতো আমার স্বর্ণচাঁপা দিনগুলো
লুঠ করে নিয়ে গেছে।
এখন সে কেড়ে নিতে চায় আমার শেষ সম্বল
আমার শান্তাকে
নিষ্ঠুর, নির্মম।

নীলাদ্রি : এখনও তারই ছায়া!

শবরী : দুঃস্বপ্নের ছায়া
মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি
কে যেন শান্তাকে চুরি করে নিয়ে যায়
পাহাড়ের বাঁকে পথ হারিয়ে আমি ডাকি,

শান্তা, শান্তা···কোথায় আমার শান্তা ?
আমি ছুটে যাই তাকে খুঁজতে ।
প্রতিধ্বনি ফেটে পড়ে অট্টহাসিতে
সে হাসি আমার চেনা···অবিকল সুজয়ের কণ্ঠস্বর ।

নীলাদ্রি : তার মুখ ?

শবরী : মুখটাই তার মুখোশ
আমিই শুধু চিনতে ভুল করেছিলুম ।

[নীলাদ্রি উঠে পায়চারি করে । সমুদ্রের দিকে তাকায় । দূরে বাতিঘরের ঘূর্ণ্যমান আলো দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে । বাতাসের দীর্ঘশ্বাস । শান্তা ছুটতে ছুটতে ঢোকে]

শান্তা : (মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে) মা দ্যাখো,
কত ঝিনুক কুড়িয়েছি ।

[বালির পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে]

ওমা, আমার কাঁকড়াসোনা কোথায় ?
এই যে, একটা···দুটো·· তিনটে · চারটে
আয় এদিকে আয় বলছি ।

নীলাদ্রি : (শবরীকে) তোমার রোহিণী আছে তো ?
একটু তৃষ্ণা মেটাবার আয়োজন করতে বলি ।

[ভিতরে চলে যায়]

শান্তা : মা, তুমি অমন করে বসে আছ কেন ?

শবরী : একটু গল্প করছিলুম ।

শান্তা : কী গল্প ?

শবরী : এক রাজকন্যার, যার ভারি দুঃখ ।

শান্তা : ও গল্প আমি শুনব না ।
আজ কি বাবা আসবে ?

শবরী : তোমার বাবা তো আমার কাছে
আসবেন না ।

শান্তা : আমি বাবার কাছে যাব ।

শবরী : আমাকে ছেড়ে যাবি তুই ?

শান্তা : তুমি বাবাকে ভালোবাসো না ?

শবরী ঃ শান্তা !

শান্তা ঃ আমি জানি, আমি জানি মা
তোমরা কেউ কাউকে ভালবাসো না ।

শবরী ঃ ও কথা বলছিস কেন ?
আমি তো তোকে ভালোবাসি,
তুই তো আমাকে ভলোবাসিস ।

শান্তা ঃ আমি সব্বাইকে ভালোবাসি
তুমি আমার মা···আমার সোনা মা ।

[মাকে আদর করে]

শবরী ঃ রোহিণী, রোহিণী

[পরিচারিকা রোহিণী চায়ের ট্রে নিয়ে ঢোকে । সঙ্গে নীলাদ্রি ।]

শান্তা, তুমি এখন রোহিণীর সঙ্গে যাও

রোহিণী ঃ এসো দিদিমণি, আমরা যাই
দুজনে খেলা করিগে ।

[শান্তাকে নিয়ে রোহিণী চলে যায় । নীলাদ্রি চা খেতে খেতে টেবিল থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে শিরোনামগুলো জোরে জোরে পড়তে থাকে ।]

নীলাদ্রি ঃ যা করেছি তার জন্য অনুতপ্ত নই ;
বন্দীরা মৃত্যুর সময়েও তৃষ্ণার জল পায়নি ;
ময়দানের একশো গাছ বিদায় নিতে চলেছে ;
পাখিরা আসছে চিড়িয়াখানার লেকে ।

শবরী ঃ কোথাকার পাখি ?

নীলাদ্রি ঃ সুদূর সাইবেরিয়ার ।

শবরী ঃ কী করে ওরা পথ খুঁজে পায় ?
কে ওদের নিশানা বলে দেয় ?

নীলাদ্রি ঃ ঝরনা যেমন জানে তার নদীকে
ভ্রমর যেমন জানে ফুটন্ত পদ্মদল
এইসব পাখিরাও আকাশের গন্ধ চিনে চিনে
দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেয় নির্ভুল ডানায় ।

শবরী ঃ শীতের অতিথি ওরা ফিরে যায়

একই পথে ?

নীলাদ্রি ঃ আকাশের উষ্ণতা ওদের ডেকে নিয়ে আসে
ওদের আছে ডানা, আছে মাটির আকর্ষণ
ওরা রৌদ্রের করতলে ছায়া ফেলে সুখে।

শবরী ঃ শুধু আমরাই পথ ভুল করি।

নীলাদ্রি ঃ সে ভুল তো তোমার নয় শবরী,
তুমি পিছনের দিকে তাকিও না।
অফুরন্ত রোদের ভিতর তুমি দ্যাখোনি
পাখিরা কেমন সহজেই ডানা মেলে ওড়ে।

শবরী ঃ শান্তা আমাকে ভুল বুঝবে
এ আমি সইতে পারব না।
আমারই রক্ত দিয়ে গড়া যার অস্তিত্ব
তার ভুল বোঝা নির্মম অভিশাপ।

[রোহিণীর প্রবেশ]

বাতিঘর থেকে লোক ডাকছে বাবুকে।

নীলাদ্রি ঃ আমি আসছি শবরী,
এসে আমরা বেড়াতে যাব।

[নীলাদ্রি চলে যায়। প্রকাণ্ড বেলুন হাতে নিয়ে শান্তা ঢোকে। রোহিণী বেরিয়ে যায়।]

শান্তা ঃ মা

শবরী ঃ (হঠাৎ চমক ভেঙে) বেড়ানো হয়ে গেল ?

শান্তা ঃ আমি এখন তোমার কাছে থাকব।

শবরী ঃ আমি একটু বেরব নীলাদ্রির সঙ্গে।

শান্তা ঃ আমিও যাব।

শবরী ঃ এখন তুমি যাবে না,
আমরা এক্ষুণি আসব।

শান্তা ঃ না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

[মায়ের আঁচল ধরে মাথা নীচু করে থাকে। তারপর মায়ের বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।]

শবরী। (আদর করে) বুড়ো মেয়ে আবার কাঁদে।

শান্তা ঃ না, তুমি যাবে না।
আমি তোমার কাছে থাকব।

শবরী ঃ রোহিণী, রোহিণী।

শান্তা ? না না আমি রোহিণীর কাছে থাকব না
তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে চলো
আমি এখানে থাকব না
আমি এখানে কাউকে ভালোবাসি না।

শবরী ঃ শান্তা, অমন অবুঝ হোসনে শান্তা।

শান্তা ঃ তুমি যাবে না, যাবে না, কোথাও যাবে না
তুমি ওই বাতিঘরের দিকে আর যাবে না।
তুমি গেলে আমি ও-সমুদ্রে হারিয়ে যাব
ঠিক দেখো।

শবরী ঃ (আর্তকণ্ঠে) শান্তা, তুই চুপ কর শান্তা,
চুপ কর।

[শান্তাকে জড়িয়ে ধরে শবরী কাঁদতে থাকে। বাতিঘরের ঘূর্ণ্যমান আলোর রেখা অন্ধকার আকাশের বুকে পথের নিশানা দেখায়। রাত্রির বুকে শোনা যায় তট-ভাঙা ঢেউয়ের নিরবচ্ছিন্ন ছলাৎছল শব্দ। সেও ওদের দুজনের কান্নারই মতো।]

প ট ক্ষে প